উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

চতুর্থ সেমেস্টার

ঐচ্ছিক পত্র – ৪০৫

নাট্যতত্ত্ব, রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস ও নাটক

পর্যায় – ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

FOREWORD

The Self Learning Material (SLM) is written with the aim of providing simple and organized study content to all the learners. The SLMs are prepared on the framework of being mutually cohesive, internally consistent and structured as per the university's syllabi. It is a humble attempt to give glimpses of the various approaches and dimensions to the topic of study and to kindle the learner's interest to the subject

We have tried to put together information from various sources into this book that has been written in an engaging style with interesting and relevant examples. It introduces you to the insights of subject concepts and theories and presents them in a way that is easy to understand and comprehend.

We always believe in continuous improvement and would periodically update the content in the very interest of the learners. It may be added that despite enormous efforts and coordination, there is every possibility for some omission or inadequacy in few areas or topics, which would definitely be rectified in future.

We hope you enjoy learning from this book and the experience truly enrich your learning and help you to advance in your career and future endeavours.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় - ক

একক ১। নাট্যতত্ত্বের ভূমিকা, সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য এবং ইংরেজী নাটক, নাটকের উপাদান এবং গঠনকৌশল, ত্রিবিধ ঐক্য, অঙ্কবিভাজন।

একক ২। নাটকের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনা।

একক ৩। নাটক এবং মঞ্চব্যবস্থা, কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়ের সূচনা।

একক ৪। লেবেডেফ এবং তাঁর The Bengally Theatre।

একক ৫। সখের নাট্যশালায় নাটকাভিনয়।

একক ৬। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

একক ৭। 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' এবং ব্যবসায়িক থিয়েটারের উত্থান।

পর্যায় - খ

একক ৮। নাট্যকার দীনবন্ধু ও 'সধবার একাদশী' - একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা,বঙ্গরঙ্গমঞ্চে 'সধবার একাদশী' নাটকের অভিনয়।

একক ৯। 'সধবার একাদশী' - চরিত্রবিচার, গঠন কৌশল, নামকরণের সার্থকতা ।

একক ১০। 'সধবার একাদশী' - গোত্র নির্ণয়, উদ্দেশ্যমূলকতা, সংলাপ, এবং অশ্লীলতা।

একক ১১। টিনের তলোয়ার : নাট্যকার পরিচিতি, উৎপল দত্তের নাটকে রাজনীতি।

একক ১২। 'টিনের তলোয়ার' : প্রেক্ষাপট, চরিত্রবিচার।

একক ১৩। 'চাক ভাঙা মধু' : নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্র।

একক ১৪। 'চাক ভাঙা মধু' - রাজনীতি, সামগ্রিক পর্যালোচনা ও চরিত্রবিচার।

ঐচ্ছিক পত্র ৪০৫ – নাট্যতত্ত্ব, রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস ও নাটক

একক ১। নাট্যতত্ত্বের ভূমিকা,সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য এবং ইংরেজী নাটক, নাটকীয়তা এবং অতিনাটক, নাটকীয় দ্বন্দ্বের প্রকৃতি, নাটকের উপাদান এবং গঠনকৌশল, ত্রিবিধ ঐক্যের ধারণা, নাটকের অঙ্কবিভাগের পাঁচটি পর্যায়।

একক ২। নাটকের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনা - পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক নাটক, রূপকথা বিষয়ক নাটক, চরিত নাটক, উপস্থাপনা রীতির ভিত্তিতে নাটকের শ্রেণীবিভাগ।

একক ৩। নাটক এবং মঞ্চব্যবস্থা, কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়ের সূচনা – ভূমিকা, নাটক এবং মঞ্চব্যবস্থা, কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়ের সূচনা।

একক ৪। লেবেডেফ এবং তাঁর The Bengally Theatre- বাঙালীর যাত্রার ঐতিহ্য, লেবেডেফ এবং তাঁর রঙ্গালয়, অভিনয়ের বর্ণনা, সীমাবদ্ধতা, গুরুত্ব।

একক ৫। সখের নাট্যশালায় নাটকাভিনয় – ভূমিকা, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার', নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালা, ওরিয়েন্টাল

থিয়েটার, আশুতোষ দেব বা সাতুবাবুর নাট্যশালা, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়, অন্যান্য নাট্যশালা, সখের নাট্যশালার গুরুত্ব।

একক ৬। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস – ভূমিকা, বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার, ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, অভিনয়ের বর্ণনা, সংঘাত এবং ফলশ্রুতি, মূল্যায়ন, বেঙ্গল থিয়েটার।

একক ৭। 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' এবং ব্যবসায়িক থিয়েটারের উত্থান – ভূমিকা, বাংলা নাটকে স্বদেশাত্মক চিন্তাধারা, অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন, রঙ্গমঞ্চে প্রভাব, ব্যবসায়িক থিয়েটারের উত্থান, গুর্মুখ রায়ের স্টার থিয়েটার, এমারেল্ড থিয়েটার।

একক ১ - নাট্যতত্ত্বের ভূমিকা - সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য এবং ইংরেজী নাটক, নাটকের উপাদান,গঠন কৌশল, ত্রিবিধ ঐক্য এবং অঙ্কবিভাজন

বিন্যাস ক্রম

১.১ ভূমিকা

১.২ সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য এবং ইংরেজী নাটক

১.৩ নাটকীয়তা এবং অতিনাটক

১.৪ নাটকীয় দ্বন্দ্বের প্রকৃতি

১.৫ নাটকের গঠনকৌশল

১.৬ ত্রিবিধ ঐক্যের ধারণা

১.৭ নাটকের অঙ্কবিভাগের পাঁচটি পর্যায়

১.৮ অনুশীলনী

১.৯ গ্রন্থঋণ

১.১ ভূমিকা

সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণগুলির মধ্যে একমাত্র নাটকেরই সুনির্দিষ্ট শিল্প-সংরূপ রয়েছে।নাটক প্রধানত সংলাপ নির্ভর সৃজন।বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তির দ্বারা এর নির্মাণ হতে হবে।নাটকের এই প্রাথমিক শর্তটিকে কোনভাবেই লঙ্ঘন করা

যায়না।তবে সংলাপ নির্ভর যে কোন শিল্প প্রকরণই নাটক নয়।উপন্যাস বা ছোটগল্পের সংরূপের মধ্যেও সংলাপধর্মিতা থাকতে পারে।যদিও নাটকের ক্ষেত্রে সংলাপের গুরুত্ব ঠিক কতটা তা পরবর্তী ক্ষেত্রে আলোচনা করা যেতে পারে।

বয়সের নিরিখে নাটক একটি অত্যন্ত প্রাচীন শিল্প প্রকরণ।সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বাংলা ভাষায় নাটকের উদ্ভবকাল ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে,গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেডেফের নাট্যপ্রচেষ্টাটির সাথেই বাংলা নাটকের যাত্রাপথ সূচিত হল।তবে তা ছিল বিদেশী নাটকের বাংলা অনুবাদ।বাংলা মৌলিক নাটকের উদ্ভব এরও অনেক পরে,উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।বাংলা নাটকের যাত্রাপথটি পরিপুষ্টি লাভ করেছে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য - উভয় নাট্যাদর্শের দ্বারাই।আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই নাটক অভিনয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়।নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে নাটক 'পঞ্চম বেদ'।এই নাট্য সৃষ্টির আদিতে রয়েছে সঙ্গীত এবং নৃত্য।ভরতের নাট্যশাস্ত্র সঙ্গীত-নৃত্য-অভিনয় কলা বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ যা আমাদের দেশজ নাট্যনির্মাণ এবং শৈলীর বিভিন্ন ক্ষেত্রকে বোঝবার জন্য অবধারিতভাবেই প্রাসঙ্গিক।অনুমান করা হয় এই গ্রন্থটি খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল।সুতরাং আমাদের দেশের নাট্যকলা যে কতটা প্রাচীন তা বোঝাবার জন্য স্বল্প পরিসরে এর থেকে বেশী কিছুর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অন্যদিকে পাশ্চাত্য নাটকের কথা বলতে গেলেই স্মরণ করতে হয় এর আদি জন্মভূমি অর্থাৎ গ্রীসকে।প্রাচীন গ্রীস শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শনচিন্তায় এক বিস্ময়কর উৎকর্ষের পরিচয় ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছে।প্রাচীনকালেই গ্রীক নাট্যকলার প্রভূত পরিমাণে অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছিল সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের রচনাকে অবলম্বন করে।ইস্কাইলাস,সোফোক্লেস,ইউরিপিদিস প্রমুখের নাটক সেই সুপ্রাচীন শিল্পকীর্তির অনন্য নিদর্শন।অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিকস' গ্রন্থে সোফোক্লেসের নাটককে সামনে রেখেই নাটককে মানবিক ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।গ্রিক শব্দ 'dram' যার অর্থ কিছু করা, 'to do' বা 'to act' - এর থেকেই 'drama' শব্দটির উৎপত্তি যা মূলত পদ্য কিংবা গদ্য সংলাপ দ্বারা নির্মিত

অভিনয়োপযোগী একটি শিল্পকর্ম।আর একটি প্রসঙ্গও স্মরণ করা প্রয়োজন যে প্রাচীনকালে ধর্মের সঙ্গে নাটক ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত ছিলো।পরবর্তীকালে নাটকের বিবর্তনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জনসমাজের ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১.২ সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য এবং ইংরেজী নাটক

নাটকের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হল তার দৃশ্যত্ব বা অভিনেয়ত্ব।এই গুণটিই নাটককে অন্যান্য সাহিত্য সংরূপগুলির থেকে আলাদা করেছে।সংস্কৃত আলংকারিকগণ কাব্যসাহিত্যের দুটি বিভাগ নির্দেশ করেছেন,যথা - দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য।নাটককে তাঁরা দৃশ্যকাব্যের পর্যায়ভুক্ত করেছেন এবং তাঁদের মতানুযায়ী এই কাব্য সকল প্রকার কাব্যসাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিকস' গ্রন্থে নাটকের অভিনেয়ত্বকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেই ট্র্যাজেডির ষড়ঙ্গ সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন।পাশ্চাত্য সমালোচক Marjorie Boulton তাঁর 'The Anatomy of Drama' গ্রন্থে যে মন্তব্যটি করেছেন তার মধ্যে দিয়েও নাটকের দৃশ্যত্বের গুরুত্ব সম্যকরূপে প্রতিভাত হয়।তাঁর মতে - 'It is a literature that walks and talks before our eyes.' কোন কোন নাটক পাঠ্য হিসেবে অত্যন্ত ভালো লাগলেও মূলত অভিনেয়ত্বের ওপরেই নাটকের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে।নাটক অভিনয়ের কারণেই রচিত হয়,সেকারণেই তাতে মঞ্চনির্দেশনা দেখা যায়।বাংলা সাহিত্যে নাটকের বিষয়গত পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন।তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী জীবনের যে অনুভূতি দৃশ্য অর্থাৎ কথায় এবং আচরণে যা অন্যের কাছে ব্যক্ত হতে পারে,একমাত্র তাই নাটকের বিষয়বস্তু রূপে গৃহীত হওয়া উচিত।

সংস্কৃত নাটকের শুরু হয় 'পূর্ব্বরঙ্গ' বা 'মঙ্গলাচরণ' এর মাধ্যমে।এরপরেই সূত্রধর যিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ,সংস্কৃতজ্ঞ এবং অভিনয়-কুশলী তিনি রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে 'নান্দী' পাঠ করবেন।মঙ্গলাচরণ শেষে 'সভাপূজা',তারপর 'কবিসংজ্ঞা' অর্থাৎ নাটকের বিষয় সম্বন্ধীয় কথোপকথন এবং 'প্রস্তাবনা'।প্রস্তাবনার পরেই সাধারণতঃ প্রথম অঙ্কের আরম্ভ।নায়ক ছাড়া অন্যান্য চরিত্রেরা 'সূচিত' হয়েই মঞ্চে প্রবেশ করে।নাটকের ভাষা

গদ্য বা পদ্য উভয়াশ্রিতই হতে পারে।যদিও সংস্কৃত নাটকে সাধারণতঃ বিদ্বানপুরুষের সংস্কৃত,বিদূষী মহিলাগণের শৌরসেনী,রাজপুত্র এবং শ্রেষ্ঠিদের অর্দ্ধ-মাগধী,বিদূষকের প্রাচ্য এবং ধূর্ত্তের অবন্তিক ভাষা ব্যবহারের কথা জানা যায়।সংস্কৃত নাটকের বিষয়বস্তু যেমন কোন বিখ্যাত বৃত্তান্ত,যেমন রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী থেকে সংগৃহীত হতে পারে,সেরকমই কবি-কল্পনার দ্বারা সৃজিত কোন উপাখ্যান অথবা মিশ্রিতও হতে পারে।সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে চার ধরণের নায়কের উল্লেখ রয়েছে - ধীরোদাত্ত,ধীরললিত,ধীরপ্রশান্ত এবং ধীরোদ্ধত।নায়ক চরিত্রটি দানশীল,কৃতী,রূপবান,কার্য্যকুশল,লোকরঞ্জক,তেজস্বী,পণ্ডিত এবং সুশীল হতে পারে। 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থে চার শ্রেণীর নায়কের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে - "যে নায়ক আত্মশ্লাঘা করে না,হর্ষবিষাদে অভিভূত হয় না,বিনয় দ্বারা গর্ব্বকে প্রচ্ছন্ন রাখে ও যাহা অঙ্গীকার করে,তাহা নির্ব্বাহ করে,তাহাকে ধীরোদাত্ত বলে।যথা - যুধিষ্ঠির ও রামচন্দ্র।যাহার নায়কসামান্য অনেক গুণ আছে,তাহাকে ধীরপ্রশান্ত কহে।যথা - মালতিমাধবাদিতে মাধবাদি।মায়াবী,উদ্ধত,চঞ্চল,অহঙ্কার ও দর্পে পরিপূর্ণ ও আত্মশ্লাঘা পরায়ণ ব্যক্তি ধীরোদ্ধত।যথা - ভীমসেন।যে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত,নম্র, এবং নৃত্যগীতাদিতে আসক্ত,তাহাকে ধীরললিত বলে।যথা - রত্নাবলীতে বৎসরাজাদি।"নাট্যশাস্ত্রে নাটকের অঙ্কসংখ্যা পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত হতে পারে।প্রত্যেকটি অঙ্কে গর্ভাঙ্কের উপস্থিতি থাকা সম্ভব।আলংকারিকদের মতানুযায়ী নাটকের প্রধান বা অঙ্গী রস শৃঙ্গার বা বীর,তবে কখনো শান্ত রসও বিকল্পে থাকতে পারে,কিন্তু করুণ রসাশ্রিত বিয়োগান্ত রূপকের কোন স্থান নেই।যেহেতু নট বা অভিনেতা অন্যের রূপ পরিগ্রহ করে অভিনয় করে,তাই ভরত নাটকের অপর নামনির্দেশ করেছেন 'রূপক'।বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং অবস্থানুযায়ী চার প্রকারের অভিনয়ের কথা আলংকারিকগণ উল্লেখ করেছেন,যথা - আঙ্গিক,বাচিক,আহার্য এবং সাত্ত্বিক।আচার-আচরণ ও অঙ্গবিক্ষেপের দ্বারা নিষ্পন্ন অভিনয়কে 'আঙ্গিক',বচন অর্থাৎ সঠিক সংলাপ উচ্চারণের দ্বারা অভিনয়কে 'বাচিক',সাজসজ্জা,নেপথ্য-বিধান,বেশ-রচনার দ্বারা মায়া সৃষ্টিকে 'আহার্য' এবং

অভিনয়ের দ্বারা সত্ত্বাদিভাবের উদ্রেকে অনুভূতির সঞ্চার ঘটানোর ব্যাপারে সচেতন থাকলে তাকে 'সাত্ত্বিক' অভিনয় বলে।

বাংলা নাটক তার শৈশবের দিনগুলিতে সংস্কৃত নাটকের আদর্শকে অবলম্বন করতে চেয়ে জড়তাগ্রস্ত এবং কৃত্রিম হয়ে পড়েছিল।পরবর্তীতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত,দীনবন্ধু মিত্রের মতো নাট্যপ্রণেতাদের আবির্ভাবের সাথে সাথে ইংরেজী নাট্যাদর্শকে স্বীকার করে নিয়ে আমাদের নাট্যপ্রচেষ্টা বিবর্তিত হয়।এই ইংরেজী নাটকের ইতিহাস অবশ্য ততটা প্রাচীন নয়।মূলত গ্রীক এবং লাতিন ধ্রুপদী নাটকের আদর্শে ইংরেজী নাটকের সূচনা এবং পরবর্তীতে শেক্সপীয়রের মতো কিংবদন্তীর হাতে তার বিবর্তন সমৃদ্ধির সময়পর্বকে স্পর্শ করে।গ্রীক নাট্যাদর্শ থেকে স্বতন্ত্র একটি ঘরানার উদ্ভব শেক্সপীয়রের আবির্ভাবের সাথে সাথেই সূচিত হয়ে যায়।উপরন্তু শেক্সপীয়র নিজেই পরিণত হন একটি প্রতিষ্ঠানে।বাংলা নাটক শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতির প্রভাবকে শিরোধার্য করে নিয়েই তার বিকাশের পরিসরটিকে খুঁজে পেতে চেয়েছিল।পরবর্তীতে গিরিশ ঘোষের মতো সফল এবং সমর্থ নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনয় শিক্ষক নিজের দলের নটনটীদের শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয় দেখাতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করতেন না।আসলে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে ট্র্যাজিক সংবিদের ধারণা আমরা ইংরেজী এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে গ্রীক নাট্যাদর্শ থেকেই গ্রহণ করেছি।

১.৩ নাটকীয়তা এবং অতিনাটক

নাট্যধারণার সঙ্গে সংযুক্ত কোন ঘটনা বা অনুভূতির পরিচয় পেলেই তা হয়ে ওঠে নাটকীয়।এই নাটকীয়তার সঞ্চার তখনই ঘটতে পারে যখন মানুষের সুখ-দুঃখ পরিপূর্ণ দ্বন্দ্বময় জীবন নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।দ্বন্দ্বহীন শান্ত,নির্লিপ্ত জীবন অন্য যে কোন সাহিত্য সংরূপের ভিত্তিস্বরূপ হতে পারে।কিন্তু দ্বন্দ্বহীন মানুষের জীবনের জীবন নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারে না।একইভাবে বস্তুধর্মিতা বা objectivity ছাড়াও নাটক অসম্পূর্ণ।সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগগুলিতে সাহিত্যিক নিজের মনের যাবতীয় অনুভূতি,পটভূমি,চরিত্রের মনোপ্রদেশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলিকে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত বা বর্ণনা করতে পারেন।কিন্তু নাটকে এমনটা হওয়ার কোন উপায় নেই।নাটক কয়েকটি

চরিত্রকে অবলম্বন করে এগিয়ে যায়।যে চরিত্রগুলির মুখে সংলাপ বসিয়ে থাকেন নাট্যকার।কিন্তু সেই সংলাপ রচনার ক্ষেত্রেও তাকে বহন করতে হয় অদ্ভুত নির্লিপ্ততা।একটি সার্থক নাটকে নাট্যকার কখনোই নিজের বক্তব্য বা ধ্যানধারণাগুলিকে যথেচ্ছভাবে চরিত্রের সংলাপে প্রয়োগ করতে পারেন না।সেরকম হলে নাটকের চরিত্রেরা হয়ে ওঠে নাট্যকারের ক্রীড়নক মাত্র।এটি কোন উৎকৃষ্ট নাটকের লক্ষণ হতে পারেনা।সুতরাং নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখেই একজন সফল নাটককার মানুষের সংঘাতপূর্ণ জীবনের ছবি আমাদের চোখের সামনে পরিবেশন করে চলেন।সেখানে সংঘাতময় জীবনের আভাস লাভ করা মাত্রই দর্শক নাটকটির নাট্যগুণ সম্পর্কে নিঃসন্দিহান হন এবং অভিনয়ক্রিয়াটি উপভোগ করতে থাকেন।

অন্যদিকে 'অতিনাটক' ব্যাপারটি নাটকের একপ্রকার ত্রুটি হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। 'সাহিত্য সন্দর্শন' গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দাশ বলেছেন - "প্রাচীন গ্রীক নাট্য-সাহিত্যে সঙ্গীত-সমন্বিত নাটককেই Melodrama নামে অভিহিত করা হইত।কিন্তু অধুনা,যে নাটকে কাল্পনিক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া চিত্তচমৎকারী,অস্বাভাবিক ঘটনা-বিন্যাসের সাহায্যে আকস্মিক ও লোমহর্ষক পরিণতি দান করা হয়,তাহাকে আমরা অতি-নাটক বা Melodrama বলিয়া অভিহিত করি।"কোন নাটক সার্থক ট্র্যাজেডি হয়ে উঠতে না পারলে তাকেও আমরা অতিনাটক বলি।এই ধরনের নাট্যকর্মে সাধারণত চরিত্রের সুর খুব চড়া তারে বাঁধা হয়ে থাকে।এখানে পর্যায়ক্রমিকভাবে ঘটনাসংস্থানগুলি হয় অবিশ্বাস্য ভঙ্গীতে।সুতরাং এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকা উচিত নয় যে বর্তমানে ভালো নাটক সৃজনের ক্ষেত্রে অতিনাটকীয়তা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং সার্থক নাট্যসম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করে।

১.৪ নাটকীয় দ্বন্দ্বের প্রকৃতি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দ্বন্দ্বময়তা যে কোন নাটকের একটি প্রাথমিক শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিকসে' ট্র্যাজেডিকে বলেছিলেন 'imitation of an action'; এই অনুকরণ মানুষের কর্মবৃত্তির যাকে আমরা নাট্যক্রিয়া

বলে চিহ্নিত করতে পারি।নাটকের দ্বন্দ্বের দ্বারাই নাট্যক্রিয়ার সূচনা হয়।বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ,অঙ্গবিক্ষেপ,সাজসজ্জার প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে মানুষের গতিশীল,পরিবর্তমান জীবনসত্যটি অভিনয়ের মাধ্যমে বাস্তব হয়ে ফুটে ওঠে।দর্শক সেই অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়,দৃষ্টি ও শ্রুতির মাধ্যমে তার মনোলোকে অনুভূতির সঞ্চার ঘটে।

প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য যে কোন নাটকের ঐতিহ্যের দিকে তাকালে বোঝা যাবে নাটকীয় দ্বন্দ্বময়তার প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের হতে পারে।যুগজীবনের পরিবর্তনের সাথেই নাটকে দ্বন্দ্বের প্রকৃতি বদলে গিয়েছে।দ্বন্দ্বময়তা নাটকের বহিরঙ্গের থেকে চরিত্রের অন্তরঙ্গ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।যেমন গ্রীক নাটকের কথা আলোচিত হতে পারে।সেখানে দ্বন্দ্ব ছিলো মূলত বাইরের ব্যাপার।ইস্কাইলাস,সোফোক্লেস প্রমুখের নাটকে মানুষের দ্বন্দ্ব ছিলো মুখ্যত অদৃশ্য এবং অজ্ঞেয় এক নিয়তি বা দৈবশক্তির সঙ্গে।গ্রীক ট্র্যাজেডিতে নায়ক সর্বক্ষেত্রেই হবেন সাধারণের থেকে অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত একজন মানুষ।তাঁর উচ্চ চরিত্র মহিমা থাকবে,একইসাথে থাকবে শক্তি,খ্যাতি এবং ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্য।তিনি তার অসাধারণ কর্মপ্রবণতায় কিছু একটা অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাইবেন,কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিয়তিলাঞ্ছিত হওয়ার কারণে তিনি দৈবশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হতে পারবেন না,ক্রমশ হেরে যাবেন।তার লাঞ্ছনা এবং কষ্টভোগ যতই বাড়তে থাকবে ততই জমে উঠবে ট্র্যাজেডির রস।এই অসম দ্বন্দ্বের চিত্র আমরা দেখতে পেয়েছি গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলিতে,যেমন - সোফেক্লেসের 'অয়দিপাউস' নাটকে।

পরবর্তীতে নাটকে দৈবশক্তির স্থান গ্রহণ করেছে রাজশক্তি বা শাসকশক্তি।রাজশক্তির বিরুদ্ধে একক ব্যক্তির লড়াই হয়েছে উৎকৃষ্ট নাটকের বিষয়বস্তু।ব্যক্তিমানুষের সাথে সমাজের সংঘাতে সমাজ সমস্যামূলক নাটকগুলি রচিত হতে থাকে।বার্নার্ড শ,জন গলসওয়ার্দি প্রমুখের নাটকে কিংবা বাংলা ভাষায় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ',বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে দ্বন্দ্বের এই প্রকৃতি দুর্লক্ষ্য নয়।

আবার দ্বন্দ্বের আরেকটি দিক হল দুটি পৃথক মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব।সেই দ্বন্দ্ব ক্ষমতালাভ,খ্যাতি বা অর্থের কারণে ঘনিয়ে উঠতে পারে।দুটি আলাদা ব্যক্তিত্বের মধ্যে

এই দ্বন্দ্বের নাটকীয়তা আমাদের তীব্রভাবে আলোড়িত করে।শেক্সপীয়রের নাটকে ওথেলোর সঙ্গে ইয়াগোর দ্বন্দ্ব,জুলিয়াস সীজারের সঙ্গে ব্রুটাসের দ্বন্দ্ব কিংবা বাংলায় গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকে রমেশের সঙ্গে যোগেশের দ্বন্দ্ব - সবই এই ধরনের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের পর্যায়ভুক্ত।

ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের আর একটি স্বতন্ত্র দিক হল ভাবগত বা আদর্শগত বিরোধ। 'বিসর্জন' নাটকে গোবিন্দমাণিক্য এবং রঘুপতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তার কারণ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শের দ্বন্দ্ব।ক্ষমতা বা অর্থলোভের কারণে এই দ্বন্দ্ব পল্লবিত হয়ে ওঠেনি।

গ্রীক নাটকের দৈব বা নিয়তির সাথে ব্যক্তির দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রটি ইংরেজী নাটকে শেক্সপীয়রের হাতে কিছুটা পরিবর্তিত হয়।শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডিতে চরিত্রের মধ্যেই তার পতনের বীজ লুকিয়ে থাকে।এর থেকেই জন্ম নেয় তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব বা inner conflict, এই দ্বন্দ্ব চরিত্রের গভীরতম প্রদেশে সংঘটিত হয় - বাসনা,কর্তব্যবোধ এবং বাস্তবতার সঙ্গে বিবেক,হৃদয়াবেগ ও আদর্শের টানাপোড়েনে মানুষের মনোলোক দ্বিধা বা বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।ব্যাক্তিমানসের এই অন্তর্লীন তীব্র দ্বন্দ্ব নাট্যকার মর্মস্পর্শী ভাষায় নাটকের মধ্যে পরিবেশন করেন।ব্যক্তির doings এবং sufferfering-কে কেন্দ্র করেই উন্মোচিত হয় আধুনিক নাটকে চরিত্রের গভীর আত্মসংকট।শেক্সপীয়রের হ্যামলেট বা ম্যাকবেথের মধ্যে এই সংকট সর্বোচ্চ বিন্দুকে স্পর্শ করেছে।হেনরিক ইবসেনের নোরা('এ ডলস প্লে') বা রবীন্দ্রনাথের জয়সিংহের (বিসর্জন') মধ্যেও আমরা অন্তর্দ্বন্দ্ব-বিক্ষত হৃদয়ের চিত্র পর্যবেক্ষণ করি।

১.৫ নাটকের উপাদান এবং গঠনকৌশল

অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিকস'-এ ট্র্যাজেডিকে ষড়ঙ্গ শিল্প বলে বর্ণনা করেছেন।তাঁর বর্ণিত ট্র্যাজেডির ছয়টি উপাদান হল যথাক্রমে -

ক। প্লট বা কাহিনী

খ। চরিত্র বা Character

গ। অভিপ্রায় বা ভাবনা বা Thought

ঘ। ভাষা বা রচনারীতি

ঙ। দৃশ্যসজ্জা, এবং

চ। সঙ্গীত

- এর মধ্যে ভাষা, সঙ্গীত এবং দৃশ্যসজ্জা বহিরঙ্গের দিক যাদের দৃশ্যত্ব সৃষ্টির উপাদান হিসেবেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।অন্যদিকে কাহিনী,চরিত্র এবং অভিপ্রায় হল ট্র্যাজেডির অন্তরঙ্গ উপাদান।এই উপাদানগুলির যথাযথ সংযোজনের ওপর কোন নাটকের সাফল্য নির্ভর করে।এইটুকু মাথায় রাখা উচিত যে নাটক একটি 'composite art' যা আবহ,রূপসজ্জা,কণ্ঠশৈলী, অঙ্গবিক্ষেপ,আলোর ব্যবহার,সংলাপ,অভিনেতা,রঙ্গমঞ্চ এবং সর্বোপরি দর্শক সকলের যথাযথ সমন্বয় ঘটিয়েই সার্থকতা লাভ করে।

ক। প্লট বা কাহিনীঃ নাটকের সংজ্ঞার কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে নাটক হল লোকবৃত্তের দৃশ্য রসরূপ।বৃত্তের আশ্রয় না পেলে রস কখনোই নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনা এবং পারেনা বলেই রস সৃষ্টি বলতে বৃত্ত পরিকল্পনাকেই বোঝায়।নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা ভরত এই বৃত্ত বা প্লটকে নাট্যের শরীরের সঙ্গে তুলনা করেছেন।দেহ-আত্মার উপমা দিয়ে তিনি বলেছেন প্রত্যেকটি নাটক আসলে ইতিবৃত্ত রচনা যার আত্মা ভাব বা রস এবং দেহ হল ঘটনা-পরম্পরা।তবে কি ঘটনা-পরম্পরা মাত্রেই ইতিবৃত্ত?প্লট সংক্রান্ত আলোচনায় এই প্রশ্ন সর্বদাই ঘুরে ফিরে এসেছে।নাট্যতাত্ত্বিকদের মতে নিছক গল্প বা ঘটনা-পরম্পরা মাত্রেই বৃত্ত বা প্লট নয়।প্লট বলতে বোঝায় বিভিন্ন ঘটনাপুঞ্জের পরিকল্পিত,অন্বয়যুক্ত একটি পরম্পরাকে যা নাট্যদ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে একটি ক্রমপরিণামের দিকে অগ্রসর হয়।বৃত্ত হল একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিশেষভাবে নির্বাচিত এবং বিন্যস্ত বহু ঘটনার সমবায়ে গঠিত একটি একক কার্য।এই ঘটনাগুলির পরস্পরের সঙ্গে ঐক্যের নিবিড় বাঁধনে জড়িত।

প্লট বা বৃত্তের আলোচনায় নাটকের ত্রিবিধ ঐক্যের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে।এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট করা হবে।প্লট মাত্রেই যে আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত তাৎপর্যপূর্ণ,ঔৎসুক্যময় ঘটনারাজির সমাবেশ সে বিষয়ে আমরা অবগত হয়েছি।স্বয়ং অ্যারিস্টটল তাঁর গ্রন্থে এই সংক্রান্ত আলোচনাটিকে উপস্থাপিত করেছেন।প্রতিটি বৃত্তই সামগ্রিকভাবে কতগুলি বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত,যথা ঐক্যসম্পন্ন ,সন্ধিসমন্বিত, অগ্রগতিশীল, ক্রমবিন্যস্ত,ঔৎসুক্যময় এবং আবেগময়।এই সমস্ত উপকরণগুলির সুষ্ঠু সংযোজনের ফলেই একটি যথাযথ বৃত্তগঠন সম্ভব।বৃত্তের কাহিনী 'সরল' বা 'জটিল' দুই ধরনেরই হতে পারে।অ্যারিস্টটল প্লটের আলোচনায় ত্রিবিধ ঐক্যের কথা বললেও উপবৃত্তযুক্ত প্লটের প্রসঙ্গে তিনি কোন নির্দেশ দেন নি।পরবর্তীকালে শেক্সপীয়র ও তাঁর অনুসারীদের নাটকে বৃত্তের পাশেই উপবৃত্তের সংযোজন মূল ঘটনাস্রোতে আরো অধিক পরিমাণে অর্থদ্যোতনা এবং ব্যাপকত্ব সঞ্চারিত করে।ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও ইতিবৃত্ত পরিকল্পনা এবং সন্ধিনিরূপণের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে -

"ইতিবৃত্তং দ্বিধা চৈব বুধস্তু পরিকল্পয়েৎ/আধিকারিকমেকং স্যাৎ প্রাসঙ্গিকমথাপরম"

- অর্থাৎ ইতিবৃত্ত পরিকল্পনায় দুটি কাহিনী থাকবে, একটি 'আধিকারিক কাহিনী',যাকে আমরা main plot বলে অভিহিত করতে পারি এবং অন্যটি হল sub plot যাকে ভরত 'প্রাসঙ্গিক' বলে নির্দেশ করেছেন।আধিকারিক কাহিনীর উপকারার্থে আনুষঙ্গিক যা কিছু কাহিনীতে যুক্ত হবে তাই হল প্রাসঙ্গিক।তবে মুখ্য ঘটনার বিরোধী বিষয়গুলিকে পরিহার না করলে তা যে কাহিনীর প্রধান রসনিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে নাট্যশাস্ত্র আমাদের সে ব্যাপারেও অবহিত করে।

খ। চরিত্রঃ প্লটের পরেই নাটকের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল চরিত্র।একে বাদ দিয়ে নাটকের আলোচনা সম্পূর্ণ হয়না।চরিত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অ্যারিস্টটল বলেছেন যে চরিত্র বলতে সেই ধর্মকেই বোঝায় যে ধর্ম থাকার ফলে ব্যক্তিতে দোষগুণ আরোপিত হয়।এই ধর্মই এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র করে।এই ধর্ম

থেকেই তার আচরণ ও কর্ম জন্ম নেয় এবং বিশিষ্টতা পায়।আমরা জেনেছি নাটক মানুষের কর্মবৃত্তির অনুকরণ যা ঐক্যসমন্বিত,তাৎপর্যপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনার এক সুনির্দিষ্ট অন্বয়।ঘটনা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই চরিত্র এবং চিন্তার বিশিষ্টতা দেখা যায়।চরিত্র সরল,জটিল,গভীর কিংবা অগভীর নানা ধরনের হতে পারে। Conflict বা নাট্যদ্বন্দ্বের ওপর ভিত্তি করেও চরিত্রের বিভাজন করা হয়ে থাকে।অ্যারিস্টটলের মতে চরিত্র নির্মাণে সর্বপ্রথমে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে চরিত্রটিকে ভালো হতে হবে।এই ভালোত্ব যে প্রকৃতিগুলির ওপরে নির্ভর করে সেগুলি হল - নৈতিক আদর্শ(It must be good),ঔচিত্য(propriety), বাস্তবতা(true to life) এবং সঙ্গতি*(consistency)*।মনে রাখতে হবে নাট্যকাহিনীতে সকলেই চরিত্র নয়,নাট্যক্রিয়ায় যাদের তাৎপর্য রয়েছে এবং নাটেযিক দ্বন্দ্বের সাথে যারা সক্রিয়ভাবে যুক্ত একমাত্র তারাই চরিত্র হিসেবে গণ্য হতে পারে।

গ। অভিপ্রায় বা ভাবনাঃ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নাটকে জীবনের যে রূপটিকে-রসঘন করে পরিবেশিত হয় 'ভাবনা'য় সেই রূপটিই ভাবের মধ্যে মুক্তি লাভ করে।এককথায় বলা যায় ভাবের তত্ত্বরূপ হল ভাবনা।অ্যারিস্টটলের মতানুযায়ী - "ভাষার দ্বারা সৃষ্ট ও উৎপন্ন সমস্ত প্রতিবেদনই অভিপ্রায়ের অন্তর্গত - এর কিছু হল প্রমাণ,(যুক্তি ও) যুক্তি খণ্ডন,করুণা-ভয়-ক্রোধ ইত্যাদি অনুভূতির জাগরণ,বক্তব্যের অতিরঞ্জন বা লঘুকরণ।" আসলে ভাবনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয় চরিত্রের মানসিক অবস্থা।এই ভাবনার দ্বারাই চরিত্রের কাজ-কর্ম নির্ধারিত হয় এবং তার ওপরেই চরিত্রের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে।

ঘ। ভাষা বা রচনারীতিঃ অ্যারিস্টটলের মতে রচনার প্রথম গুণ 'স্পষ্টতা' কিন্তু বৈশিষ্ট্যহীনতা নয়।এক্ষেত্রে তিনি শব্দ ব্যবহারের ওপরে জোর দিয়েছেন।পরিচিত শব্দের ব্যবহার রচনায় স্পষ্টতা আনে।অন্যদিকে অ-পরিচিত শব্দগুলি রচনায় আভিজাত্য এনে দেয়।অ-পরিচিত শব্দ বলতে তিনি 'স্বল্পব্যবহৃত শব্দ,রূপক,দীর্ঘীকৃত শব্দ ও পরিচিত শব্দের অতিরিক্ত শব্দ'গুলিকে বুঝিয়েছেন।তাঁর মতে কবিকে একটি মিশ্রিত রচনারীতির ব্যবহার করতে হবে যা সৌন্দর্য,ছন্দময়তা এবং সৌষম্যের সৃষ্টি

করবে।নাটকের সমস্ত কথাগুলি নাট্যকারকে বলতে হয় সংলাপের মাধ্যমে।নাটকের সংলাপ অভিভাবকহীন।এর মাধ্যমেই নাট্যকার দর্শকের মনে কাঙ্ক্ষিত রস সঞ্চারিত করেন।

ঙ। দৃশ্যসজ্জাঃ নাটক মঞ্চে অভিনয় করা হয়।মঞ্চস্থাপত্য বা দৃশ্যপট নাটককে দেয় তার নিজস্ব পরিবেশ যা নাটকে সজীবতার সঞ্চার করে।নাটকের দৃশ্য রস-সৃষ্টির পরিপোষণের দ্বারা চরিত্রের পরিস্থিতি এবং অবস্থানকে অভিব্যক্ত করে।অ্যারিস্টটল দৃশ্যসজ্জাকে অলংকারীর কাজ বলে বর্ণনা করেছেন।বাইওয়াটারের মতানুযায়ী অলংকারী হল পরিচ্ছদ বা রঙ্গমঞ্চের নির্মাতা।অ্যারিস্টটল উল্লেখ করেছেন - 'The spectacle has,indeed an emotional attraction of its own,but,of all the parts it is the least artistic and connected least with the art of poetry...' ।দৃশ্যপট যোজনা নাটকের পক্ষে একটি অপরিহারেয উপাদান হলেও শুধুমাত্র দৃশ্যরচনার দ্বারা রসসৃষ্টির প্রয়াস দুর্বলতার নিদর্শন।

চ। সঙ্গীতঃ 'পোয়েটিকস' গ্রন্থে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডিতে কোরাসের অপরিহার্যতার কথা বলেছেন।বাস্তবিকপক্ষেই গ্রীক নাটকের বিবর্তনকে অনেকেই 'কোরাসের সঙ্গে সংলাপের প্রাধান্যলাভের প্রতিযোগিতার ইতিহাস' বলে বর্ণনা করেছেন।সংলাপের প্রাধান্য বাড়ার সাথে সাথেই নাটকে সঙ্গীতের অবস্থান গৌণ হয়ে পড়েছে,কমেছে সঙ্গীতের উপযোগিতা।যে নাটকগুলিতে গানের দ্বারা রস-সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে,তাদের পরবর্তীকালে কুলীন নাটকের থেকে বিচ্ছিন্ন করে মেলোড্রামা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।তবে মনে রাখা প্রয়োজন যেখানে গানের ব্যবহার স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে চলে,সেখানে তা নিন্দনীয় নয়।যদিও এই সংক্রান্ত ধারণায় যুগ এবং দেশভেদে বদল ঘটেছে।

১.৬ ত্রিবিধ ঐক্যের ধারণা

নাটক বিচারের ক্ষেত্রে ধ্রুপদী নাট্য-সমালোচকেরা সর্বদা তিন প্রকার ঐক্যনীতির বিষয়ে সচেতন থাকেন।প্রাচীন গ্রীক তাত্ত্বিকদের কাছে ত্রিবিধ ঐক্যের গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য।পরবর্তীকালেও ত্রিবিধ ঐক্যের বিষয়ে সমালোচক,তাত্ত্বিকদের মধ্যে বহুবার মতামতের বিনিময় ঘটেছে।অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিকস' গ্রন্থে কাহিনীর ঐক্যের বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেছেন।যাই হোক,ক্ল্যাসিক ঘরানার সমালোচকেরা যথার্থ নাটকের যে তিন প্রকারের ঐক্যের কথা বলেছেন সেগুলি হল -

১. সময়ের ঐক্য বা Unity of Time,

২. স্থানের ঐক্য বা Unity of Place, এবং

৩. ঘটনার ঐক্য বা Unity of Action

- 'সময়ের ঐক্য' প্রসঙ্গে বলা হয় যে নাটকের আখ্যানবস্তুকে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে যে সময় প্রয়োজন,বাস্তব জীবনেও যেন সেই ঘটনা সংঘটিত হতে একই সময় লাগে।অ্যারিস্টটলের মতানুযায়ী এই সময় 'a single revolution of the sun' অর্থাৎ ২৪ ঘন্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা কাঙ্খিত।এখান থেকেই 'স্থানগত ঐক্য' সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের মতামতটিকে আমরা কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারি।নাটকের মধ্যে এমন কোন স্থানের উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়,নাট্য নির্দেশিত সময়ের মধ্যে যেখানে নাটকের কুশীলবদের যাতায়াত সম্ভব নয়।অন্যদিকে শেক্সপীয়র মনে করতেন একটি নাটকের অভিনয়কাল দুই ঘন্টা হওয়াটাই যথাযথ।সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে উপরোক্ত দুই প্রকার ঐক্যের ধারণাটি শেক্সপীয়রের মতানুযায়ী কিছুটা বদলে যায়।

নাটকের 'ঘটনাগত ঐক্যে'র বিষয়টিকে প্রাচীন থেকে নবীন সকল সমালোচকই গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষণ করেছেন।নাটকে এমন কোন ঘটনা সংস্থান অনভিপ্রেত যাতে নাটকের মূল সুরটি ব্যাহত হয়।নাটকের বিভিন্ন চরিত্র ও দৃশ্যগুলির মধ্যে একটি সমগ্রতার উপস্থিতি থাকবে যাতে সম্পূর্ণ নাটকটি একক ও অখণ্ডরূপে দর্শকের সামনে প্রতীয়মান হয়।এই সমগ্রতার ধারণা আমরা 'পোয়েটিকসে'ও দেখতে

পাই।অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডি মানুষের যে কর্মবৃত্তির অনুকরণ,সেই ক্রিয়াটি পরিপূর্ণ এবং সমগ্র।তা একটি বিশেষ আয়তনবিশিষ্ট এবং তা আদি-মধ্য-অন্তে বিন্যস্ত থাকবে।এই বিন্যাস নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা দ্বারা নিরূপিত।আয়তন এবং শৃঙ্খলার সাযুজ্যেই কোনকিছুর মধ্যে সৌন্দর্য সঞ্চারিত হয়।নাটকের আয়তনের ক্ষেত্রেএ এই সামঞ্জস্যবোধ প্রয়োজনীয়।অতিবড়ত্ব বা অতিক্ষুদ্রত্ব দুটিই আপত্তিকর,কারণ তার মধ্যে দিয়ে সমগ্রতার ধারণা যথাযথভাবে প্রকাশিত হয় না।নাটকের আখ্যানবস্তুর দৈর্ঘ্য স্মৃতিসাধ্যের বাইরে না যায় সেদিকে নজর রাখতে হবে।এক্ষেত্রে অ্যারিস্টটলের নির্দেশ - "যে দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্ভাব্য এবং প্রয়োজনীয় ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে দুঃখ থেকে সুখ অথবা সুখ থেকে দুঃখের পরিবর্তন দেখানো যায়,সেই দৈর্ঘ্যই আয়তনের যথার্থ সীমা।"

আয়তনের মতোই কাহিনীর এককত্ব সম্পর্কেও অ্যারিস্টটল যথাযথ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।একজন মানুষের জীবনের সমস্ত কথা ব্যক্ত করলেই কাহিনীর মধ্যে ঐক্য জন্মায় না।আমাদের জীবনে নানারকমের ঘটনা ঘটতে পারে যাদের একটির সঙ্গে আরেকটির কোন ঐক্য নাও থাকতে পারে।মানুষ সারাজীবনে এমন অনেক ক্রিয়া সম্পন্ন করে।সেই সমস্ত ক্রিয়াগুলি মিলে একটি সম্পূর্ণ একক ক্রিয়া গড়ে ওঠেনা।তাই মানুষের জীবনের সব ঘটনা গ্রথিত হলেই যে কাহিনীতে এককত্ব সঞ্চারিত হবে এমনটা নয়।এক্ষেত্রে 'হেরাক্লেইদা' বা 'থেসেইদা' জাতীয় কাব্যের সাথে তিনি মহাকবি হোমারের 'ইলিয়াদ' ও 'ওদিসি'র তুলনা করেছেন।আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন একটি নাটকে একটিমাত্র ঘটনা বা বিষয়কেই উপস্থাপিত করতে হবে।যে সব ঘটনার একটির সঙ্গে অন্যটির কার্যকারণগত যোগাযোগ দেখানো সম্ভব নয় এবং যা কাহিনীর একমুখী ক্রমপরিণতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে,নাটকে তাদের সংযুক্তির ফলে ঘটনা ঐক্য ব্যাহত হয়।সুতরাং নাটকে তাদের উপস্থাপনের থেকে বিরত থাকতে হবে।কিন্তু যে সমস্ত ঘটনা একটি বিশেষ ঘটনার আনুষঙ্গিক হতে সমর্থ,তাদের বিন্যাসে ঘটনা ঐক্য ব্যাহত হয় না।সুতরাং ঘটনা ঐক্যের যথাযথ সংযোজন ব্যতীত নাটকের আখ্যানবস্তুতে সমগ্রতা বা এককত্ব সৃষ্টি করা যায় না।আখ্যানবস্তুর বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে একটি জমাট ঐক্য থাকার অর্থ হল শৃঙ্খলা অনুযায়ী তাদের নির্দিষ্ট সজ্জা,যার

মধ্যে থেকে কোন একটিকে যদি কোনভাবে পরিবর্তিত করা হয় অথবা সরিয়ে নেওয়া হয় তবে সমগ্র কাহিনীটিই বিচ্যুত এবং বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে।কারণ কোন ঘটনার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি যদি নাটকের গঠনের মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়া না তৈরী করে,তবে তাকে সমগ্রের জৈবিক অঙ্গ বলা যায় না।

বলা বাহুল্য,গ্রীক নাটকের এই ত্রিবিধ ঐক্যের ধারণা পরবর্তীকালে সর্বক্ষেত্রে মেনে চলা সম্ভব হয়নি।সমালোচক হাডসনের মতে, শেক্সপীয়রের 'The Comedy of Errors' এবং 'The Tempest' - এই দুটি নাটকেই কেবল ত্রিবিধ ঐক্যবিধি অনুসৃত হয়েছে।তবে ঘটনাগত ঐক্য মেনে চলার ওপরে সমস্ত নাট্যকার,তাত্ত্বিকেরাই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।ঘটনাগত ঐক্য লঙ্ঘিত হলে নাটকের সমগ্রতা ও এককত্বের ধারণাটি অটুট থাকেনা,যার ফলে নাট্যরস ব্যাহত হয়।সংস্কৃত নাট্যাদর্শে ত্রয়ী ঐক্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।ভবভূতির 'উত্তররামচরিত'-এ দুটি ঘটনার মধ্যে দীর্ঘ বারো বছরের ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়।আবার ভরতের নাট্যশাস্ত্রে একটি অঙ্কে একদিনের ঘটনা সংস্থাপনের নির্দেশ ছিল যার সমর্থন আমরা বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণে'ও পাই।বাংলা নাটক প্রথম থেকেই ইংরেজী নাটকের আদর্শকে গ্রহণ করেছিল বলে এখানে প্রায় সর্বত্র ঘটনাগত ঐক্যের ধারণাটি মেনে চলা হয়,যদিও কয়েকটি নাটকে তার ব্যতিক্রম চোখে পড়বে।কিন্তু সে সব ক্ষেত্রগুলিতে নাটকটির রসবোধেরও হানি ঘটেছে।আবার রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি নাটকে স্থানগত ঐক্য মেনে নিয়ে নাট্যক্রিয়াকে একটি দৃশ্যপটে সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

১.৭ নাটকের অঙ্কবিভাগের পাঁচটি পর্যায়

সাধারণভাবে পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত নাটকের পাঁচটি পর্যায়ের ক্রমবিন্যাসকে পাশ্চাত্য সমালোচক Gustav Freytag একটি পিরামিডের গঠনের সাথে তুলনা করেছেন।নাটকের সনাতনপন্থী পঞ্চমাঙ্ক গঠন দেখাবার জন্য আমরা এই পিরামিড-আকৃতি ব্যবহার করি।এই পিরামিড অনুযায়ী একটি পঞ্চাঙ্ক নাটকের পাঁচটি পর্যায় হল যথাক্রমে -

ক। সূচনা বা প্রারম্ভ (Exposition): প্রতিটি নাটক একটি দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই তার পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়।সেই দ্বন্দ্ব শারীরিক,মানসিক,ভাবগত,আদর্শগত বিভিন্ন রকমের হতে পারে।নাটকের প্রথম অঙ্কে আমরা নাটকীয় দ্বন্দ্বের প্রাথমিক পরিচয়টুকু লাভ করতে চাই,পেতে চাই দ্বন্দ্বের সুস্পষ্ট আভাস।একইসাথে দ্বন্দ্বের উভয় পক্ষের প্রধান কুশীলবদের সাথে আমাদের প্রারম্ভিক পরিচয় ঘটে নাটকের প্রথম অঙ্কেই।নাটকের প্রধান দ্বন্দ্বটি উন্মোচিত হয় বলে একে Exposition বা উন্মোচন বলা হয়।তবে এটি সূচনা বা প্রারম্ভ বা Initial Incident নামেও পরিচিত।যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' নাটকের প্রথম অঙ্কেই রাণী গুণবতী সন্তান-আকাঙ্ক্ষায় দেবীর কাছে প্রতি বছর চারশো প্রাণ বলি দেবার মানত থেকেই দ্বন্দ্বের প্রকৃতিটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।এই দ্বন্দ্ব যে দুটি ভিন্ন ভাবাদর্শের,দুটি আলাদা বিশ্বাসের,মানবধর্মের সঙ্গে প্রজন্মলালিত প্রথার বিরোধ,তা বুঝে নিতে আমাদের কোন অসুবিধে হয় না।

খ। জটিলতা ও প্রবাহ (Complication & Development): নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কটিকে Complication বা জটিলতা সৃষ্টি, Growth বা বৃদ্ধি বিভিন্ন নামে পরিচায়িত করা হয়।নাটকের প্রথম অঙ্কে যে বিরোধ বা দ্বন্দ্বের স্বরূপটি উন্মোচিত হয় দ্বিতীয় অঙ্কে তাকে কেন্দ্র করেই কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।বিভিন্ন ঘটনা সংঘটনের ফলে সমস্যার সমাধান ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ে।নাট্যকাহিনীর এই উর্ধ্বগতির কালে নাটকের বৃত্ত ও উপবৃত্তগুলির সন্নিবেশে ঘটনাক্রমের ক্রমবিস্তার ঘটে।এই বিস্তার হয় মূলত একটি অনিবার্যতার নিয়মকে স্বীকার করে নিয়ে এবং নির্দিষ্ট কার্যকারণ-শৃঙ্খল মেনে।

গ। চরমোন্নতি বা শীর্ষবিন্দু (Climax): নাটকের তৃতীয় অঙ্কেই নাট্যকাহিনী Rising Action এর সর্বোচ্চ শিখরটিকে স্পর্শ করে।এই পর্যায়টি চরমোন্নতি বা Climax নামে পরিচিত।দ্বিতীয় অঙ্কে জটিলতা সৃষ্টির পর এখানে নাট্যদ্বন্দ্ব তার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছয়।চরমোন্নতি নাটকের চরমতম ঘটনা নয়।এখানে নাটকীয় দ্বন্দ্ব তার সর্বোচ্চ বিন্দুটিকে স্পর্শ করলেও দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ নিরসন এখানে ঘটেনা।তবে চরম সংঘাতপূর্ণ

নাট্যকাহিনীর দ্বন্দ্ব-নিরসন ঠিক কোন্ পথে ঘটবে তার একটা আভাস আমরা এখানে পেয়ে যাই।এই পর্যায়েই আমরা নিশ্চিত হই নাট্যকাহিনীর অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে,সেই অবস্থায় যে পরিণতির পরিবর্তনের আর কোন সম্ভাবনা নেই। 'বিসর্জন' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আমরা রঘুপতির সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের বিরোধকে জটিলতর হতে দেখি।সমস্ত জটিলতার টানাপোড়েনে জয়সিংহ নামক একক ব্যক্তিটির দ্বিধাদীর্ণ হৃদয় দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে।একদিকে রঘুপতি,তার পালকপিতা যেমন তার কাছে সর্বস্ব,তেমনি মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের প্রতিও তার গভীর অনুরাগ।একদিকে আজন্মলালিত বিশ্বাসের শিকড়,অন্যদিকে অপর্ণার আহ্বান - এই দুইয়ের মধ্যে সে কোন পথ অবলম্বন করবে তা জয়সিংহ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেনা।তার সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটেছে নাটকের শেষে,তার অসহায়,করুণ আত্মহননের মধ্যে দিয়ে।এই ঘটনাই নাটকের সবথেকে বড়ো ঘটনা।কিন্তু এমন একটি পরিণামই যে অপেক্ষা করে আছে,এমনকি জয়সিংহের আত্মবিসর্জনের মধ্যে দিয়েই যে নাট্যদ্বন্দ্বের নিরসন ঘটবে,রক্তপাতের মধ্যে দিয়েই যে অবসিত হবে সকল বিরোধ,তা নাটকের তৃতীয় অঙ্কে জয়সিংহের সংলাপের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ। গ্রন্থিমোচন বা অবনয়ন(Falling Action): তৃতীয় অঙ্কে শীর্ষবিন্দুকে স্পর্শ করার পর নাট্যকাহিনী গ্রন্থিমোচনের মধ্যে দিয়ে তার একমুখী অনিবার্য পরিণামের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।একে আমরা Falling Action বা অবনয়ন-ও বলে থাকি।নাট্যকাহিনীর জটিল গ্রন্থিগুলি এবারে সরল হথে থাকে এবং যে পরিণতির আভাস আমরা পূর্বে লাভ করেছিলাম,কাহিনী ধীরে ধীরে সেদিকেই অগ্রসর হতে থাকে।যেমন 'বিসর্জন' নাটকে রঘুপতি তার উদ্দেশ্যপূরণের জন্য হীনত্বের শেষতম বিন্দুটিকেও অতিক্রম করে গিয়েছেন।

ঙ। সমাপ্তি বা উপসংহার*(Catastrophe):* পূর্ণাঙ্গ নাটকের সর্বশেষ পর্যায়টি হল Catastrophe বা সমাপ্তি।একে Conclusion-ও বলা হয়।এই পর্বে সমস্ত জটিলতার অবসান ঘটে এবং নাট্যদ্বন্দ্বের বিশ্বাসযোগ্য পরিণামের দ্বারা নাটকের উপসংহারটিকেও যথাযথভাবে অনুভবযোগ্য করে ফুটিয়ে তুলতে হয়।

একটি পঞ্চমাঙ্ক বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ নাটকের এই পাঁচটি পর্যায়কে Freytag যে পিরামিড-আকৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন,পরবর্তীকালের সমালোচকেরা Climax বা শীর্ষবিন্দুকে কেন্দ্র করে সেই পিরামিড-গঠনের আলাদা আলাদা অনেকগুলি অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন।যেমন শেক্সপীয়রের 'কিং লিয়র' এবং 'ওথেলো' নাটকদুটির ক্ষেত্রে চরমোন্নতির মুহূর্ত যেহেতু ভিন্ন সেহেতু তাদের পিরামিড-রেখাচিত্র দুটি পরস্পর থেকে ভিন্ন রকমের হবে।যাই হোক,আধুনিক নাটকের পরিসরে এই সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন কমে এসেছে।বাস্তবতাবাদী নাট্য আন্দোলনের কাল থেকেই নাটকের পঞ্চাঙ্ক বিভাগ এবং প্রতিটি অঙ্কে একাধিক দৃশ্যের সংযোজনের ধারণাটি অপসৃত হতে থাকে।এই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা জর্জ বার্নার্ড শ তাঁর অধিকাংশ নাটকই রচনা করেছেন তিন অঙ্কে।হেনরিক ইবসেনের নাটকগুলিও পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট নাট্যনির্মাণের ধারণাটিকে খণ্ডন করেছে।তাঁর প্রধান নাটকগুলির বেশিরভাগই চার অঙ্কের।বর্তমানে একাঙ্ক নাটকের অভিনয় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যেখানে নাটকের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে অক্ষত রেখে প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা গ্রহণের অবকাশ রয়েছে।

বাংলা নাটক প্রথমাবধি ইংরেজী নাটকের আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একাধিক নাটকে প্রচলিত রীতি অতিক্রমের দৃষ্টান্ত রয়েছে। 'মালিনী' নাটক মাত্র চারটি দৃশ্যে সীমাবদ্ধ।অন্যদিকে 'রক্তকরবী' বা 'মুক্তধারা'র মতে নাটকে দৃশ্যসংখ্যা কেবলমাত্র একটি।বাংলা নাটকের গঠনগত বিবর্তনের চিত্রটি স্পষ্ট হয় গণনাট্য এবং তারও পরে নবনাট্য আন্দোলনের সময় থেকে,যখন বিজন ভট্টাচার্য,তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ নাট্যকারদের আবির্ভাবে বাঙালীর নাট্যমনস্কতায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

১.৮ অনুশীলনী

ক। নাটকীয়তা কাকে বলে? একটি নাটক কখন অতিনাটকীয় হয়ে ওঠে?

খ। নাটকীয় দ্বন্দ্ব কাকে বলে? নাট্যকাহিনীতে এর গুরুত্ব কী? নাট্যদ্বন্দ্বের বিভিন্ন প্রকৃতিগুলির বর্ণনা দাও।

গ। বিভিন্ন নাট্যতাত্ত্বিকদের মতানুযায়ী ত্রিবিধ ঐক্যের ধারণাটিকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ। বাংলা নাটকে অঙ্কবিভাগের ক্ষেত্রে কোন আদর্শকে অনুসরণ করা হয়? এই আদর্শ অনুযায়ী পঞ্চমাঙ্ক নাটকের পাঁচটি পর্যায়ের বর্ণনা দাও।

ঙ। নাটকে প্লটের গুরুত্ব বর্ণনা কর।নাটকে চরিত্র এবং সংলাপের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

১.৯ গ্রন্থঋণ

ক। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা - ড.সাধনকুমার ভট্টাচার্য

খ। সাহিত্য সন্দর্শন - শ্রীশচন্দ্র দাশ

গ। সাহিত্য প্রকরণ - ড.হীরেন চট্টোপাধ্যায়

ঘ। সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ - কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

ঙ। সাহিত্যের রূপ-রীতি - ড.মিহির চৌধুরী কামিল্যা

একক ২ - নাটকের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনা

বিন্যাস ক্রম

২.১ নাটকের শ্রেণীবিভাজনের বিভিন্ন দিক

২.২ পৌরাণিক নাটক

২.৩ ঐতিহাসিক নাটক

২.৪ সামাজিক নাটক

২.৫ রূপকথা বিষয়ক নাটক

২.৬ চরিত নাটক

২.৭ উপস্থাপনা রীতির ভিত্তিতে নাটকের শ্রেণীবিভাগ

২.৮ অনুশীলনী

২.৯ গ্রন্থঋণ

২.১ নাটকের শ্রেণীবিভাজনের বিভিন্ন দিক

নাট্য কাহিনীর পরিণতি ও রসবিচারের ভিত্তিতে সনাতনপন্থী তাত্ত্বিকেরা নাটকের দুটি শ্রেণী নির্দেশ করেছিলেন,যথা - Tragedy বা বিয়োগান্তক নাটক এবং Comedy বা মিলনান্তক নাটক।এই দুটিই নাটকের উদ্ভবেতিহাসের ধারায় তার প্রাথমিক বিভাগ।পরবর্তীকালে দেশ-কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিটি সাহিত্য সংরূপের জটিলতাই বৃদ্ধি পেয়েছে।নাটকেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি যেহেতু নাটক মানুষের

মন্তব্য

চলমান জীবনের অভিনেয় অনুকরণ,তার কর্মবৃত্তির দৃশ্য রসরূপ।নাট্য সমালোচকেরা বিভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে নাটকের আলাদা আলাদা শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন।বর্তমানে কাহিনীর উৎস এবং বিষয়বস্তু,অঙ্কসংখ্যা,উপস্থাপনা রীতি,উদ্দেশ্য,গঠন - প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের নিরিখে আমরা কোন নাটকের প্রকৃতি বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকি।অধ্যাপক ড.সাধনকুমার ভট্টাচার্যের মতে,কাহিনীর উৎসের ভিত্তিতে নাটককে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়,যথা - পৌরাণিক নাটক,ঐতিহাসিক নাটক,সামাজিক নাটক,রূপকথা বিষয়ক নাটক এবং কাল্পনিক নাটক।এছাড়াও বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য অনুসারে আমরা নাটককে ধর্মমূলক,নীতিমূলক,রাজনীতিমূলক,প্রেমমূলক,ষড়যন্ত্রমূলক প্রভৃতি বিশেষ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।নাটকে সাংকেতিক উপস্থাপনা রীতিটিও বর্তমানে অত্যন্ত প্রচলিত।এর সাথে রূপক নাটকের কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।আয়তন বা অঙ্কসংখ্যার নিরিখে নাটককে চারটি ভাগে বিভক্ত করা সমীচীন,যথা - মহানাটক,নাটক,নাটিকা বা Playlet এবং একাঙ্ক নাটক।অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দাশ তাঁর 'সাহিত্য সন্দর্শন' গ্রন্থে নাটকের আরো কয়েকটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন।এর মধ্যে বিশেষভাবে চরিত নাটকের প্রসঙ্গটিও আলোচনা করা যেতে পারে।রচনাবন্ধের নিরিখে পদ্য,পদ্য-গদ্য মিশ্রিত এবং গদ্য নাটক তিন ধরনেরই নাটকের অস্তিত্বই আমরা প্রাচীনকাল থেকে লাভ করেছি।প্রাচীন নাটকের অধিকাংশই পদ্যে রচিত কিংবা পদ্য-গদ্য মিশ্রিত।পরবর্তীকালে নাট্যবিষয় যখন শুধুমাত্র ইতিহাস এবং পুরাণের পরিসর থেকে বেরিয়ে সামাজিক স্তরে নেমে এসেছে,ঠিক তখনই নাটক গদ্যময় হয়েছে।এই পরিবর্তনের পিছনে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে যা আমরা অনেক সময়েই উপেক্ষা করে থাকি।যাই হোক এখন আমরা আধুনিক নাটকের বিভিন্ন বিভাগগুলির আলোচনায় অগ্রসর হবো।

২.২ পৌরাণিক নাটক

পৌরাণিক নাটকের আলোচনায় প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে পুরাণবর্ণিত বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত যে কোন নাটককেই আমরা পৌরাণিক বলবো না।পৌরাণিক নাটকের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে এই মন্তব্য অতি সরলীকৃত ধারণার জন্ম দেয়।আসলে পুরাণে বর্ণিত

নয়,আবার ইতিহাসের কোন ঘটনাও নয় এমন নাটকের শ্রেণীনিরূপণ তখন দুরূহ সমস্যা তৈরী করে।ফলে পৌরাণিক শব্দটিকে সচেতনভাবেই আমরা কিছুটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করবো যার ফলে পৌরাণিক নাটকের বর্ণনা অব্যাপ্তি আর অতিব্যাপ্তি - দুইয়ের দোষ থেকেই মুক্ত হবে।

নাটকের কাহিনী পুরাণ বর্ণিত নাকি প্রাক-পৌরাণিক যুগের শুধুমাত্র সে বিচারের দ্বারা কোন নাটকের পৌরাণিকত্ব বিচার করা চলেনা।পুরাণের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে - "অতি প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও সমাজ-ধর্ম ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা।"অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দাশের মতে পৌরাণিক নাটক "রামায়ণ,মহাভারত বা প্রাচীন কোন ধর্ম্মমূলক কাহিনী অবলম্বনে লিখিত।ইহাতে অনেক সময় অতিনপ্রাকৃতের সমাবেশ দৃষ্ট হয়।নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য পৌরাণিক তথ্যসমূহকে নাটকীয় রূপ দান করা।"অলৌকিক ঘটনাবলি এবং অতিপ্রাকৃতের সমাবেশকে পৌরাণিক নাটকের অন্তরঙ্গ উপাদান বলে উল্লেখ করেছেন অনেক সমালোচক।পৌরাণিক চেতনা মাত্রেই অতিপ্রাকৃত জগত এবং দৈববিধানের অলৌকিকতায় অটুট বিশ্বাস।এই বিশ্বাসই পৌরাণিক নাটকের মূল সুর।এই ধরনের নাটকের আখ্যানে সৃষ্টিরহস্য,দেবদেবীদের মাহাত্ম্য,দৈব অনুগৃহীত ব্যক্তিবর্গের অলৌকিক ক্ষমতার নানা দৃষ্টান্ত দর্শকের সরল ভক্তিবিশ্বাসের আলোয় মূর্ত হয়ে ওঠে।তবে অতিপ্রাকৃতের অবতারণা থাকলেই আমরা তাকেই পৌরাণিক নাটক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারিনা।ঐতিহাসিক যুগের স্মরণীয় কোন সাধকের জীবনকে উপস্থাপিত করছে,তেমন ধরণের নাটকেও অতিপ্রাকৃত এবং অলৌকিক বিষয়ের সমাবেশ থাকতে পারে।কিন্তু একমাত্র সে কারণেই আমরা তাদের পৌরাণিক নাটকের পর্যায়ভুক্ত করতে পারিনা।পৌরাণিক নাটক সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য আসলে তার ভক্তিরসপ্রগাঢ়তা।পৌরাণিক নাটক মূলত ভক্তিরসাত্মক হয়ে থাকে।নাটকের প্রধান কুশীলবদের জীবনের সমস্ত দুঃখ,কষ্ট,যন্ত্রণা শেষ পর্যন্ত এখানে দেব অনুগ্রহে পরম প্রাপ্তির আনন্দে বিলীন হয়ে যায়।দৈব কৃপা লাভ করার ফলে ভক্তের জীবনের সকল দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটে।এই কারণেই তাত্ত্বিকেরা মনে করেন পৌরাণিক নাটকে ট্র্যাজিক সংবেদ সৃষ্টির প্রতিকূল একাধিক বৈশিষ্ট্যের সমাহার

ঘটেছে।আসলে ঈশ্বরের অমিত মহিমা,দেবানুগ্রহ এবং তার অলৌকিক লীলার প্রতিষ্ঠায় মানুষের জীবনের দ্বন্দ্বময়তার মর্মান্তিক সত্যটি পৌরাণিক নাটকে চাপা পড়ে যায়।যে ঈশ্বর মঙ্গলময়,তার কোন কর্মকৃতিই যে নিষ্ঠুর হতে পারেনা,এই বিশ্বাসের প্রাধান্যের ফলে লোকসাধারণের কোন দুঃখ-দুর্দশাই আমাদের মনে করুণা এব বয়ের জন্ম দেয় না।ফলে ট্র্যাজেডির রসসৃজন এই ধরনের নাটকে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।তবে ট্র্যাজিক রস নিষ্পন্ন করা কঠিন হলেও পৌরাণিক নাটকে তার প্রতিষ্ঠা যে একেবারেই অসম্ভব তা বলা যায়না।বাংলা নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'ভীষ্ম' এবং 'নরনারায়ণ' নাটক দুটির বিচার করলেই সেই সত্য প্রতিভাত হবে।

বাংলা নাটক তার শৈশবের দিনগুলিতে পৌরাণিক বিষয়কে অবলম্বন করেই বিকাশ লাভ করেছিল।তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকটি পৌরাণিক নাটক রচনার প্রাথমিক প্রয়াস।তবে বাংলায় পৌরাণিক নাটকের প্রাণপুরুষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ।তাঁর 'রাবণবধ', 'দক্ষযজ্ঞ', 'নলদময়ন্তী', 'কমলে কামিনী', 'জনা', 'পাণ্ডবগৌরব' প্রভৃতি একাধিক নাটক ভক্তিরস এবং নীতিকথার প্রাবল্যে,অদৃষ্টতত্ত্বের অকুণ্ঠ ঘোষণায় উনিশ শতকের শেষপর্বে ব্যাপক মঞ্চসাফল্য লাভ করেছিল।এই ঐতিহ্যই পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়,অপরেশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের পৌরাণিক নাটকগুলিতে চূড়ান্ত উৎকর্ষ লাভ করে।

২.৩ ঐতিহাসিক নাটক

নাটকের বিষয় ভিত্তিক বিভাগের কথা বলতে গিয়ে আমরা এরপর প্রবেশ করবো ঐতিহাসিক নাটকের আলোচনায়। খুব সাধারণ অর্থে বলতে গেলে যে নাটকের বিষয়বস্তু ইতিহাস থেকে সংগৃহীত সেই নাটকই ঐতিহাসিক নাটক।তবে ঐতিহাসিক কথাটিকে পৌরাণিক শব্দের মতোই সংকীর্ণ এবং ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা যায়।আসলে ইতিহাস মানে শুধুমাত্র রাজা-বাদশা,রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে সংঘর্ষ, যুদ্ধ ,জয়-পরাজয়ের বিবরণ মাত্র নয়। ব্যাপক অর্থে ইতিহাস বলতে মানুষের জীবনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-ধর্মনৈতিক বিভিন্ন ঘটনা আন্দোলন, আলোড়নের সামগ্রিক চিত্রকেই বোঝায়। সুতরাং রাষ্ট্রনায়কেরা যে অর্থে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব একজন সামাজিক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা বা একজন ধর্মীয় সাধকও সেই অর্থে

ঐতিহাসিক। তাই ইতিহাস থেকে সংগৃহীত যেকোনো ঘটনা বা জীবনী অনুসরণে লেখা সমস্ত নাটকগুলিকে ঐতিহাসিক বলে পরিচায়িত করতে গেলে অতিব্যাপ্তিকে কেন্দ্র করে কিছু সমস্যা তৈরী হতে পারে।আবার ঐতিহাসিক শব্দটিকে সবসময় সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করাও যে সমীচীন নয় সে বিষয়ে আগেই মন্তব্য করা হয়েছে।সব দিক বিচার করে ইতিহাসিক নাটকের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে সমালোচকেরা মূলত কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে অপরিহার্য উপাদান বলে মনে করেছেন।আসলে ঐতিহাসিক নাটকের দুটো আলাদা পরিসর রয়েছে।একদিকে যেমন ইতিহাস থেকে সংগৃহীত তথ্য,উপাদান,ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির পরিবেশনে নিষ্ঠাবান হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ যে ইতিহাসের যে কালপর্বটিকে নাট্যকর্মে চিত্রিত করা হবে,তার একটি যথাযথ এবং অবিকৃত পরিমণ্ডল নাট্যকারকে নির্মাণ করতে হয়।আবার অন্যদিকে নাটক যেহেতু শেষ পর্যন্ত একটি সাহিত্য প্রকরণ তাই শেষ পর্যন্ত তাকে শিল্পসম্মত হতে হবে।ঐতিহাসিক এবং নাট্যকারের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে।ইতিহাসের যাবতীয় ঘটনাবলীকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা ঐতিহাসিকের কাজ।নাট্যকার ইতিহাসের নীরস উপকরণ এবং চরিত্রগুলিকে কল্পনার রসে জারিত করে সর্বকালের,সর্বযুগের মানুষের কাহিনীকে শিল্পের আঙ্গিকে রসরূপ প্রদান করেন।তাই নাটকে মানুষের চিরকালীন আশা-আকাঙ্ক্ষা,সুখ-দুঃখ,যন্ত্রণা-আর্তির প্রকাশ ঘটে ঐতিহাসিক উপকরণের বাস্তবতা এবং যুগপরিবেশকে অক্ষুণ্ণ রেখেই।মনে রাখা জরুরী,ইতিহাস এবং কল্পনার যথাযথ সমন্বয় ঘটাতে না পারলে সার্থক ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে দ্বন্দ্বই হচ্ছে নাটকের প্রাণ।সে ক্ষেত্রে ইতিহাসের অন্তর্গত কোন কাহিনীতে উপযুক্ত নাটকীয়তা এবং নাট্যদ্বন্দ্বের আভাস পেলে একজন সমর্থ নাট্যকার তাকে নাটকের ভিত্তিমূল হিসেবে ব্যবহার করতেই পারেন।সমাজ বা ব্যক্তিজীবনের ইতিহাসের দ্বারা নাট্যকারের কল্পনা নিয়ন্ত্রিত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই,কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার সেই নিয়ন্ত্রিত পরিসরের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার অধিকার তার অবশ্যই আছে।এক্ষেত্রে নাট্য-তাত্ত্বিকেরা 'ঔচিত্য' শব্দটির ওপরে জোর দিতে চান।

ঔচিত্যবোধকে ক্ষুণ্ণ করলে কাহিনীর ঐতিহাসিকত্ব বিপন্ন হয় যা একটি সার্থক

ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে যথার্থভাবেই ক্রটিবহ।খাঁটি ঐতিহাসিক নাটকে ঘটনা,চরিত্র বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে নাট্যকারকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়।লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে ঘটনা এবং চরিত্রদের সম্বন্ধে আমাদের প্রতি পদক্ষেপেই সন্দেহ না জাগে।তাই ইতিহাসের নির্দিষ্ট যুগপরিবেশের বাস্তবতাকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে ঔচিত্যই নাট্যকারের পথনির্দেশক,যাকে অনুসরণ করে তিনি সার্থক নাট্যসৃষ্টির প্রচেষ্টায় উত্তীর্ণ হতে পারেন।

ইংরেজি সাহিত্যের ঐতিহাসিক নাটক রচনায় শেক্সপীয়র বিশেষ উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন।তাঁর Henry VI,Richard III,Richard II,Henry IV,Henry V,Henry VIII,Julius Caeser,Antony and Cleopatra প্রভৃতি নাটকগুলি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

বাংলায় ঐতিহাসিক নাটক রচনায় সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তার 'রাণা প্রতাপসিংহ'(১৯০৫),'দুর্গাদাস'(১৯০৫), 'নূরজাহান'(১৯০৮),'মেবার পতন'(১৯০৮),'সাজাহান'(১৯০৯),'চন্দ্রগুপ্ত'(১৯১১),'সিংহল বিজয়'(১৯১৫) প্রভৃতি নাটকগুলি একদিকে যেমন রাজপুত জাতির ইতিহাসকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে,তেমনই মুঘল আমলের পারিবারিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষপূর্ণ কাহিনীও তাঁর নাটকে সমান গুরুত্ব লাভ করেছে। চন্দ্রগুপ্ত এবং সিংহল বিজয় নাটকের মধ্যে প্রাচীন হিন্দু যুগের ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে। এই নাটকগুলি রঙ্গমঞ্চে অসাধারণভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করার পাশাপাশি ঐতিহাসিক নাটকের বিচারে যথাযথরূপে শিল্প-রসোত্তীর্ণ হয়েছিল।ঐতিহাসিক নাটকের রচনায় তাঁর সবথেকে বড় সাফল্য হল মূল ঐতিহাসিক কাহিনীর সমান্তরালে কল্পিত চরিত্র এবং উপকাহিনীর যথার্থ সন্নিবেশ ঘটিয়ে তাঁর নাটক গুলিকে শুধুমাত্র ইতিহাসের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্তি দান করেছিলেন।তিনি ছাড়া মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী',গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌল্লা','মীরকাশিম',ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য','পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত','অশোক',যোগেশ চৌধুরীর 'দিগ্বিজয়ী',অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের 'অযোধ্যার বেগম' প্রভৃতি সার্থক ঐতিহাসিক নাটকের দৃষ্টান্ত।

২.৪ সামাজিক নাটক

পুরাণ এবং ইতিহাসের পরিসরকে ছেড়ে যখন নাটক কোন সামাজিক বিষয়কে আশ্রয় করেছে,বিশেষত কোন সমাজ সমস্যা কিংবা সামাজিক বিধিনিষেধ, আচার-আচরণকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বময় মানবজীবনের বাস্তব সত্যকে মঞ্চে উদঘাটিত করেছে তখন তাকেই আমরা সামাজিক নাটক বলে অভিহিত করেছি। আসলে সামাজিক নাটক অভিধাটি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার হয়ে থাকে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তার জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত যে কোন নাটকই সামাজিক অভিধাটি লাভ করতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে একদিক থেকে এই ধরনের নাটকের বিষয় যেমন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকের থেকে পৃথক,তেমনই কাল্পনিক নাটকের বিষয়বস্তু থেকেও স্বতন্ত্র।আসলে সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক,ধর্মীয়,জাতিগত কিংবা পারিবারিক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যা আমাদের প্রাতিদিনের বেঁচে থাকাকে আলোড়িত করে তোলে।এই সমস্ত আলোড়ন,বিক্ষোভের কেন্দ্রে যে মানুষের জীবন,সমাজ সমস্যার প্রেক্ষিতে তাকেই আমরা মঞ্চের বাস্তবতায় প্রত্যক্ষ করি।সামাজিক নাটকের পাত্র-পাত্রী তাই সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষিত,পীড়িত,বিপন্ন সাধারণ মানুষ, সমাজ কিংবা পরিবারের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুঝতে গিয়ে যারা বিপর্যস্ত এবং নিঃস্ব হয়ে পড়ছে।ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকের মত সামাজিক নাটক কোনভাবেই 'খ্যাতবৃত্ত' নয়। যে সমস্যা বা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এই জাতীয় নাটকে নাট্যদ্বন্দ্বটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে,অনেকক্ষেত্রেই সেই সমস্যা বা প্রশ্নের কোন মীমাংসা করা নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব হয়না। কিন্তু তবুও নাট্যকারকে সংঘাতপূর্ণ মানবজীবনের কথা বারবার বলে যেতে হয়, আলোকপাত করতে হয় নির্দিষ্ট সমাজ সমস্যাটির উপরে।

একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যার রূপায়ণ ঘটে বলে এই ধরনের নাটককে 'সমস্যামূলক নাটক' বা 'Problem Play' *নামেও অভিহিত করা হয়।এখানে কল্পনার বিস্তার কিংবা ঘটনার আড়ম্বর তেমনভাবে থাকেনা।মূল সমস্যাটিকে কেন্দ্র করে নাট্যকার এখানে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে নিজস্ব* ideas-*কে ব্যক্ত করতে পারেন।তাই এই জাতীয় নাটকের আরেকটি নামান্তর* Thesis Play *বা* Discussion Drama.

ইউরোপে বাস্তবতাবাদী নাট্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমস্যামূলক নাটক রচনার জোয়ার আসে। হেনরিক ইবসেন,জর্জ বার্নার্ড শ,জন গলসওয়ার্দি প্রমুখের একাধিক নাটকের উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে।ইবসেনের 'A Doll's House' নাটকটি সামাজিক-সমস্যাশ্রয়ী নাটকের সার্থক উদাহরণ।বিবাহকে কেন্দ্র করে নারীর অধীনতার দিকটিএই নাটকে বাস্তবনিষ্ঠভাবে ফুটে উঠেছে।এছাড়া বার্নার্ড শ'র 'Widower's Houses' ও 'Mrs. Warren's Profession', গলসওয়ার্দির 'The Silver Box', 'Justice' এই ঘরানার নাটকের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম সামাজিক সমস্যামূলক নাটক লেখা হয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।রামনারায়ণ তর্করত্ন এই ধরনের নাট্যপ্রচেষ্টার প্রথম শরিক।তাঁর 'কুলীনকুলসর্বস্ব'(১৮৫৪) নাটকটি সেকালের কৌলিন্য প্রথার মর্মান্তিক সত্যটিকে আমাদের সামনে প্রকটিত করে।এছাড়াও তাঁর রচনাদর্শকে অনুসরণ করেই সেসময় শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় লেখেন 'বাল্যবিবাহ নাটক',উমেশচন্দ্র মিত্র রচনা করেন 'বিধবাবিবাহ নাটক' প্রভৃতি।পরবর্তীকালে নাটকে সমাজ-সমস্যার রূপায়ণের একাধিক প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'মায়াবসান', 'শাস্তি কি শান্তি' কিংবা ডি.এল রায়ের 'পরপারে', 'বঙ্গনারী' প্রভৃতি নাটকগুলি এই প্রচেষ্টার সার্থক দৃষ্টান্ত।

'প্রফুল্ল' নাটকে নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষ একটি বিশেষ যুগপরিবেশে মধ্যবিত্ত পরিবারের বিপর্যস্ত,ধ্বংস হওয়ার ইতিহাসকে যথাযথভাবে চিত্রিত করেছেন।কিভাবে ভাগ্য-বিপর্যস্ত যোগেশের 'সাজানো বাগান' শুকিয়ে গেল এবং সে পরিণত হল ট্রাজেডির নিঃস্ব নায়কে,তারই বিষাদান্ত বর্ণনা এই নাটকের উপজীব্য বিষয়।এই নাটকটি Playwright গিরিশ ঘোষের এক সার্থক নাট্যসৃষ্টি।ব্যাঙ্ক ফেল করার ফলে সুখী সামাজিক-পারিবারিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত,বিপন্ন যোগেশ শেষপর্যন্ত মাতাল হয়ে আত্মবিধ্বংসী পরিণাম ডেকে আনে।আসলে একজন ব্যক্তির আয়ের ওপর নির্ভরশীল একান্নবর্তী পরিবার সেই একক মানুষটির বিপর্যয়ের ফলে এভাবেই ভেসে যায়।আবার সামাজিক নীতিহীনতা,ব্রিটিশ আদালতের অন্যায় আচরণ,বিত্তবানের পক্ষে থাকা আইন-প্রশাসনের

অসততা এবং তৎকালীন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ভয়াবহ অনিশ্চয়তার দিকটিও এই নাটকে সমাজ-সচেতন নাট্যকার চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সমস্যামূলক নাটকের বাইরেও সামাজিক নাটকের আরো কয়েকটি উপবিভাগ নির্দেশ করা যায়।এই উপবিভাগগুলি মূলত উপস্থাপনা রীতির ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে।ব্যক্তি-চরিত্রমূলক নাটকগুলিতে সমস্যার ওপরে আলোকপাত এবং তার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির অভিযোজনের সংকটকেই বড় করে দেখানো হয়।বাংলা সামাজিক নাটক রচনার আদর্শে বড় রকমের পরিবর্তন সঞ্চারিত হয় গণনাট্য আন্দোলনের মাধ্যমে।ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল',বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন',বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা',তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' প্রভৃতি নাটকগুলিতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করা বাঙালীর মর্মলোকের এক বিচিত্র রূপায়ণ ঘটতে দেখা যায়।

২.৫ রূপকথা বিষয়ক নাটক

অধ্যাপক ডক্টর সাধন কুমার ভট্টাচার্য রূপকথা বিষয়ক নাটককে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবেই বর্ণনা করেছেন।তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী," সাধারণ কাল্পনিক(Phantasia) নাটকের সঙ্গে রূপকথা মূলক নাটকের মূল পার্থক্য এখানেই - 'রূপকথা' অতীতের কাল্পনিক কাহিনী আর 'কাল্পনিক' বর্তমানের নতুন কল্পনা।রূপকথা বিষয়ক নাটককে এই কারণেই সাধারন কাল্পনিক নাটক হতে পৃথক করা যুক্তিযুক্ত।"

পুরাণ এবং ইতিহাসের বাইরে আমাদের স্মৃতিতে রূপকথার একটি বিশিষ্ট অবস্থান রয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীতে যেরকম নানান অলৌকিক বিষয়ের সমাবেশ থাকে কিংবা ঐতিহাসিক নাটকের ইতিহাসের যে বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলা হয় তা রূপকথায় না থাকলেও এর মধ্যে থাকে এক ধরনের সর্বজনীনতা।অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বক্তব্যকে মনে রেখেই বলা যায় যে রূপকথা স্বভাবে কাল্পনিক হলেও তার কথাবস্তু সর্বজনবিদিত এবং প্রচলিত।রূপকথা নিয়ে নাটক রচনা করতে গেলেও সেখানে নিজের খেয়াল খুশিমতো কল্পনার বলগা ছুটিয়ে দেওয়া সমীচীন নয়। তাই ড.ভট্টাচার্য্য এই ঘরানার নাটকের মধ্যে এক ধরনের ঐতিহাসিকত্ব নির্দেশ করেছেন।উল্লেখ্য যে রূপকথা

বিষয়ক নাটক কাল্পনিক নাটকের মত সম্পূর্ণরূপে নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত হতে পারেনা,বরং তা অবশ্যম্ভাবী হিসেবেই ঐতিহ্য নিয়ন্ত্রিত বা প্রথার অধীন।

২.৬ চরিত নাটক

যথার্থ চরিত নাটক বা Biographical Drama রচনার ইতিহাস ততটা পুরোনো না হলেও সাধু-সন্ত-ধর্মীয় মহাপুরুষের জীবনকে কাব্য কিংবা এক বিশেষ শ্রেণীর নাটকে রূপায়িত করবার প্রবণতা মধ্যযুগীয় সাহিত্যে অপ্রতুল ছিলনা।তবু চরিত নাটকের প্রথম সফল নিদর্শন হিসেবে আমরা জন ড্রিঙ্কওয়াটারের বিখ্যাত রচনা 'Abraham Lincoln'(১৯১৮)-কেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকি।এই নাটকে একদিকে রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে উচ্চ আদর্শবোধসম্পন্ন একজন মানুষের পাশাপাশি মানবিক গুণাবলিতে ভাস্বর একজন সহজ,সরল মানুষের পরিচয়ও আমরা লাভ করি।প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাবহনকারী মানুষের কাছে এই নাটক দীর্ঘস্থায়ীভাবে প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছিল।কোনরকমের আড়ম্বরের প্রভাবমুক্ত হওয়ার কারণে নাটকের চরিত্রগুলিকে মঞ্চের বাস্তবতায় প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে কোনভাবেই অবিশ্বাস্য মনে হয়নি।ইংরেজী সাহিত্যে Housman-এর 'Under Fire'(ভিক্টোরিয়ার জীবন অবলম্বনে) David Scott Daniell-এর 'The Queen and Mr.Shakespeare' প্রভৃতি নাটকগুলিকেও চরিত নাটকের পর্যায়ে গণ্য করা যেতে পারে।

চরিত নাটকের চরিত্রেরা পুরাণ থেকে সংগৃহীত কিংবা ঐতিহাসিক - দুই ধরণেরই হতে পারে।বাংলা ভাষায় এ প্রসঙ্গে ডি.এল রায়ের 'ভীষ্ম' এবং মহেন্দ্র গুপ্তের 'মাইকেল','মহারাজ নন্দকুমার' প্রভৃতি নাটকগুলির কথা স্মরণযোগ্য।শ্রীচৈতন্য,রামমোহন,মাইকেল মধুসূদন দত্ত,বিদ্যাসাগরের মতো বিখ্যাত মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত নাটককে অনেক সমালোচক সামগ্রিক বিচারে ঐতিহাসিক চরিত নাটক বলেই চিহ্নিত করেছেন।কারণ ব্যাপক অর্থে এঁরা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব।তাছাড়া পূর্বেই বলা হয়েছে যে ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটকের শ্রেণী থেকে পৃথক করে 'চরিত নাটক' হিসেবে আর একটি শ্রেণীর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাট্যচিন্তার নিদর্শন।সেই বোধ থেকেই

বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' বা 'বিদ্যাসাগর' নাটকটিদুটিকে আমরা একালে দাঁড়িয়ে চরিত নাটকের পর্যায়ভুক্ত করতেই পারি।

শুধুমাত্র সংলাপের মাধ্যমে কোন চরিত্রকে পরিস্ফুট করতে পারলেই তা যেমন সার্থক নাটক নয়,ঠিক তেমনভাবেই মহাপুরুষের জীবনের নানান খণ্ডবিচ্ছিন্ন ঘটনাবলিকে একসূত্রে সংযোজিত করলেই তা চরিত নাটকে পর্যবসিত হয়না।এই পর্যায়ের নাটকগুলিতে নাট্যকারকে সচেতনভাবে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়।শুধুমাত্র মহৎ ব্যক্তির গুণগান নয়,তাঁর মানবিক গুণগুলিকেও যথাযথভাবে চিত্রিত করা প্রয়োজনীয়।অবাঞ্ছিত বীরপূজার মনোভাবের ফলে নাটকটি কৃত্রিম হয়ে উঠতে পারে,যার ফলে শিল্পরস ব্যাহত হয়।ঐতিহাসিক নাটকের আলোচনায় আমরা জেনেছি যে ইতিহাসখ্যাত চরিত্রকে নাটকে উপস্থাপিত করতে হলে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী যাতে ঐতিহাসিক সত্য এবং তাকে কেন্দ্র করে চরিত্রটি সম্পর্কে জনমানসে গড়ে ওঠা ধারণাটি আহত অথবা বিকৃত না হয়।এই বক্তব্যটি পৃথকভাবে চরিত নাটকের বিভাগের জন্যও একইভাবে প্রযোজ্য।কোন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের মহনীয়তাকে বিশেষ উদ্দেশ্যের বশে হেয় বা ব্যঙ্গ করা এই জাতীয় নাটকে কোনভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়।

২.৭ উপস্থাপনা রীতির ভিত্তিতে নাটকের শ্রেণীবিভাগ

অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য উপস্থাপনা রীতির ভিত্তিতে নাটকের চারটি শ্রেণীবিভাগ নির্দেশ করেছেন,যথা - Realistic বা বাস্তবিক উপস্থাপনা,Romantic বা ভাবতান্ত্রিক উপস্থাপনা,Allegorical বা রূপক উপস্থাপনা এবং সাংকেতিক উপস্থাপনা(Symbolical Representation)।

ক। বাস্তবিক উপস্থাপনাঃ যে শ্রেণীর নাটকে দেশ-কাল-পাত্র এবং ঘটনা পরম্পরার ঔচিত্য এমনভাবে রক্ষা করা হয় যার ফলে নাটকের কাহিনী বা চরিত্র সম্বন্ধে কোন সংশয় বা অবিশ্বাস দর্শক-পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয় না উপস্থাপনার সেই রীতিকে বাস্তবিক উপস্থাপনা বলা হয়ে থাকে। এই ধরনের উপস্থাপনায় নাট্যকার তার সামনের

বাস্তবতাকে যেমনভাবে দেখছেন ঠিক তেমনভাবেই নাটকে ফুটিয়ে তোলেন। আমরা জেনেছি একটি নাটক সৃষ্টি হিসেবে তখনই সফল যখন নাট্যকার তাঁর ব্যক্তিগত মতামত কিংবা অভিপ্রায়কে নাট্য-ঘটনা ও চরিত্রের থেকে দূরে রাখেন।নাট্যকার কখনোই মঞ্চের সামনে এসে উপস্থিত হন না, তিনি সর্বদাই নেপথ্যে থাকেন এবং তাঁর নৈর্ব্যক্তিকতা,বিষয়ের যথাযথ উপস্থাপনা - এগুলিই একটি বাস্তবিক প্রযোজনায় উৎকর্ষের সংযোজন করে।তবে মনে রাখতে হবে শিল্প বা সাহিত্য বাস্তবের হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়।নাটকও যেহেতু একটি বিশিষ্ট সাহিত্য সংরূপ,তাই কোন নির্দিষ্ট আদর্শের অনুকরণে একটি কৃত্রিম,আরোপিত রূপের নির্মাণ নাট্যকারের কাছে অনভিপ্রেত।

খ। ভাবতান্ত্রিক উপস্থাপনাঃ নাটকের দেশ-কাল-পাত্র ও ঘটনার মধ্যে সুসঙ্গতি বজায় রেখে বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার বদলে ভাবতান্ত্রিক উপস্থাপনায় ভাব ও রসাবেশের চমৎকারিত্ব সৃষ্টির দিকেই জোর দেওয়া হয়।এখানে ভাব ও রূপের যোগাযোগ ততটা ওতপ্রোত নয়।আসলে দেশ-কাল এবং মানুষের নিরিখে বাস্তবতার ধারণা বদলে যায়।তাই একটি বস্তুতান্ত্রিক উপস্থাপনা অন্যের কাছে ভাবতান্ত্রিক উপস্থাপনায় পর্যবসিত হয়।অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতে - একটি নাটকে "বাস্তবতা বা ঔচিত্যের কেন্দ্র থেকে উপাদানগুলো যত দূরে সরে যায়,মাটির সঙ্গে,বাস্তব সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ যত শিথিল হয়ে পড়ে ততই রচনা আকাশস্থ হতে থাকে এবং রচনার মধ্যে একটা অবাস্তবতার ছায়া ফুটে ওঠে।"

গ। রূপক উপস্থাপনাঃ সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে রূপক উপস্থাপনার রীতিটির ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। কাব্য,নাটক,আখ্যানধর্মী রচনাসহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কাহিনীর আপাত বিন্যাসের অন্তরালে আরেকটি গভীর সমান্তরাল কাহিনীর প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করেছি। রূপক শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Allegory, যার অর্থ 'to speak other'(গ্রীক)- অর্থাৎ একটি বলতে গিয়ে অন্য কিছু বোঝানো আসলে রূপক হচ্ছে এমন এক ধরনের শৈলী যাকে সাহিত্যের যে কোন সংরূপে প্রয়োগ করা যেতে পারে।এর দ্বারা রচনার আপাত উপরিতলের অর্থের গভীরে তাকে অতিক্রম করে

আরও কোন গূঢ় তাৎপর্য ভাবের ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়ে থাকে।এই ধরনের রচনায় কোন নিহিত তত্ত্ব বা ভাবের বীজ ঘটনা,চরিত্র,পরিস্থিতি প্রভৃতি উপাদানগুলিকে কেন্দ্র করে পল্লবিত হয়ে ওঠে।সেই তত্ত্ব বা ভাবকে কবি বা নাট্যকার যখন বাইরের লৌকিক জীবনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন না অথবা তার প্রকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক বিধিনিষেধের বাধা এসে উপস্থিত হয়,তখনই তিনি রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেন।তবে এবিষয় উল্লেখ্য যে রূপক রচনার সাথে কাল্পনিক রচনার বিস্তর প্রভেদ রয়েছে।রূপকের অর্থদ্যোতনাই এই প্রভেদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।সাধারণ কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যে কল্পনাশক্তির খেয়ালখুশি পরিলক্ষিত হলেও সেখানে মূল কাহিনীর অন্তরালে কোন গভীরতর সত্য বা ভাব প্রকাশের তাগিদ থাকেনা।রূপকে প্রথম কাহিনীটির প্রয়োজন ততটুকুই যতটা সেই ভাব বা তত্ত্বের অভিব্যঞ্জনার জন্য প্রয়োজনীয়।তাই রূপক উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি।সেই উদ্দেশ্য সামাজিক,রাজনৈতিক,ধর্মীয় বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে।রূপকের আবেদন আমাদের বুদ্ধির কাছে,সম্যক জ্ঞান অর্জনের দ্বারা আমরা রূপকার্থটি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারি।আসলে রূপকের ব্যবহার এক আলংকারিক কৌশলবিশেষ,যার দ্বারা কোন পরিচিত তত্ত্ব বা নীতিকে রচনাকার ছদ্মবেশের আড়ালে আমাদের বুদ্ধির কাছে প্রকাশ করতে চান,এবং সেই অন্তর্নিহিত সত্যটির আবিষ্কারেই রূপকে উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালের যাত্রা' নাটকটি তিনটি অংশে বিভক্ত,যথা - 'রথের রশি','কবির দীক্ষা' এবং সব শেষে দীর্ঘ কবিতা 'রথযাত্রা'।এই নাটিকাটিকে অনেক সমোলোচক রূপক নাটকের মর্যাদা দিয়ে থাকেন।যদিও রবীন্দ্রনাথের নাটকে রূপক এবং সাংকেতিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকলেও এই নাটকের মর্মমূল অন্বেষণে আমাদের রূপকের আরোপগুলিকে অতিক্রম করতেই হয়।সমাজ বিবর্তনের মূল সূত্রটি এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ মুন্সিয়ানায় ছদ্ম কাহিনীর অন্তরালে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন।নাটকে দড়ি,পথ,গর্ত প্রভৃতিকে প্রায় প্রতীকের মতো ব্যবহার করা হলেও তারা আদতে আচার-অনুষ্ঠান নির্ভর মানুষের অন্ধ সংস্কারের প্রতি আনুগত্যকেই প্রকাশ করে।নাটকটির সম্পূর্ণ পাঠে আমরা কাহিনীর মধ্যে নিহিত রূপকার্থটিকে আস্বাদন

করতে পেরে তৃপ্ত হই,সন্তোষ লাভ করি তার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায়,যা বুদ্ধির দ্বারাই আমাদের মননের অধিগত হয়।

ঘ। সাংকেতিক উপস্থাপনাঃ রূপক এবং সাংকেতিক নাটককে অনেকে এক গোত্রভুক্ত করে থাকেন যার কোন যৌক্তিকতা নেই।রূপক এবং সাংকেতিক উপস্থাপনার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।রূপক নাটকে সংকেতের প্রয়োগ থাকতে পারে,নাও থাকতে পারে,আবার রূপক নয় এমন নাটকেও সংকেতের অস্তিত্ব সম্ভব।সংকেত বা Symbol কথাটির গ্রীকরূপ Symballum-এর অর্থ to cast together, অর্থাৎ একত্রিত করা,সমাহৃতকরণ।একটি সংকেতের মাধ্যমেই একই সময়ে অনেকগুলি গুণধর্মকে একসাথে প্রকাশ করা যেতে পারে।অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য সংকেতকে রীতি নয় বরং বর্ণনাকৌশল বলেই চিহ্নিত করেছেন যার মাধ্যমে কোন অরূপ সত্ত্বার ওপরে রূপারোপ করা হয়ে থাকে।আসলে Symbol এক অর্থে শব্দ,পদার্থের ধ্বনি,সংকেত বা চিহ্ন।এই চিহ্ন তার বস্তুগত পরিচয়কে ছাপিয়ে গিয়ে ভিন্নতর ইঙ্গিত প্রকাশিত করে।যদিও মনে রাখা প্রয়োজন যে সব চিহ্নই প্রতীক নয়।

রূরক এবং সাংকেতিক নাটকের পার্থক্য অনুধাবন করতে হলে ইয়েটসের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য,তাঁর মতে -

"A symbol is indeed the possible expression of some invisible essence,a transparent lamp about a spiritual flame;while allegory is one of many possible representation of an embodied thing or familiar principle - the one is revelation,the other an amusement..."

- আসলে যা ইন্দ্রিয়ের অতীত,অশরীরী,অনাদি,অনন্ত,অপার্থিব,সেই অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করার জন্যই শিল্পী সংকেতের ব্যবহার করেন।তাই সংকেত তাঁর মনোলোকের অনুভূতির এক ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ।প্রতীকের জন্মলোক শিল্পীর অবচেতন মানস।আবার আমাদের অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির দেশ থেকেও তা সংগৃহীত হতে পারে।প্রতীকের মধ্যে থাকে একটি অব্যক্ত সংবেদন যাকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়না।তাই অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য সাংকেতিক উপস্থাপনাকে - "অতীন্দ্রিয় ও অরূপ-

পরাতত্ত্বের আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ - কল্পিতরূপের রূপরেখায় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রতিভাসন" বলেই বর্ণনা করেছেন।আর্থার সিমন্সের অভিমতটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য-

"It is an attempt to spiritualise literature, no evade the old bondage of exteriority.. in this endeavour to disengage,the ultimate essence,the soul of whatever exists can be realised by the consciousness."

- রূপক উপস্থাপনার মতো নিটোল,বোধগম্য কাহিনী সাংকেতিক নাটকে থাকেনা।এর মূল আবেদন আমাদের অনুভূতি এবং বোধের কাছে।শুধুমাত্র বুদ্ধির দ্বারা সংকেতের প্রকৃতি অনুধাবন করা যায় না।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'রক্তকরবী' নাটকে জাল,মরা ব্যাঙ,কুন্দফুলের মালা,রক্তকরবী সমস্ত কিছুকেই প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।প্রতীক শুধু যে অলৌকিক সত্তাকে দ্যোতিত করতে পারে,ঠিক তেমনভাবেই লৌকিক কোন তত্ত্বকে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে পারে।সাংকেতিক নাটকের উপসংহারে উপনীত হয়ে আমরা রূপক উপস্থাপনার মতো তৃপ্তি লাভ করি না,বরং আবেগ ও কল্পনার সাহায্যে অনুভূতির সেই নিবিড়তম প্রদেশকে স্পর্শ করতে পারি,যাকে উৎসমূল হিসেবে ব্যবহার করে নাট্যকার নাটকের নির্মাণ করেন।এ কথা সত্য যে অনির্বচনীয়,অরূপ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা পরাতত্ত্বের ইঙ্গিতময় রূপকল্পনার প্রয়োজনেই সাংকেতিকতার আশ্রয় গৃহীত হয়ে থাকে,কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আধ্যাত্মিক বিষয় ছাড়া সামাজিক এমনকি রাজনৈতিক তত্ত্বকেও সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব।বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সাংকেতিক নাটক রচনায় অভাবনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।তাঁর 'রাজা','রক্তকরবী','মুক্তধারা','ডাকঘর' প্রভৃতি নাটকগুলিতে সাংকেতিকতার সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।এছাড়া ইউরোপে মেটারলিঙ্কের 'The Blue Bird', ইয়েটসের 'The Countess Cathleen' ইত্যাদি এই জাতীয় নাটকের উদাহরণ।

২.৮ অনুশীলনী

১। কাহিনীর উৎসের ভিত্তিতে নাটকের একটি শ্রেণীবিভাগ প্রস্তুত কর।প্রত্যেক শ্রেণীর সংজ্ঞা এবং উদাহরণ দাও।

২। পৌরাণিক নাটক কাকে বলে?পৌরাণিক নাটকের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।

৩। ইতিহাসের খ্যাতবৃত্ত ঘটনা বা চরিত্রকে অবলম্বন করে নাটক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারকে কোন কোন বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়?চরিত নাটক কাকে বলে?ঐতিহাসিক নাটকের থেকে এটি কীভাবে স্বতন্ত্র?

৪। সামাজিক নাটক কী?সমস্যামূলক নাটক বা Problem Play এর প্রকৃতি এবং বৈশিষ্টেযগুলি লিপিবদ্ধ কর।একটি সার্থক বাংলা সামাজিক নাটকের উদাহরণ দাও।

৫।উপস্থাপনা রীতির ওপর ভিত্তি করে নাটককে কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়?প্রত্যেক শ্রেণীর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৬। সংকেত কী?সাংকেতিক নাটকের প্রধান বৈশিষেটেযগুলি বর্ণনা করো।রূপক এবং সাংকেতিক উপস্থাপনার মধ্যে মূল পার্থ্যক্যগুলি নির্দেশ করে রূপক নাটকের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো।।

৭। রূপকথা বিষয়ক নাটক কাকে বলে?এর সাথে কাল্পনিক নাটকের পার্থক্যগুলি আলোচনা করো।

২.৯ গ্রন্থঋণ

ক। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা - ড.সাধনকুমার ভট্টাচার্য

খ। সাহিত্য সন্দর্শন - শ্রীশচন্দ্র দাশ

গ। সাহিত্য প্রকরণ - ড.হীরেন চট্টোপাধ্যায়

ঘ। সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ - কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

একক ৩ - নাট্যতত্ত্বের নাটক এবং মঞ্চব্যবস্থা, কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়ের সূচনা

বিন্যাস ক্রম

৩.১ ভূমিকা

৩.২ নাটক এবং মঞ্চব্যবস্থা

৩.৩ কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়ের সূচনা

৩.৪ অনুশীলনী

৩.৫ গ্রন্থঋণ

৩.১ ভূমিকা

আধুনিক বাংলা থিয়েটারের উদ্ভবকাল সম্পর্কে থিয়েটারের ইতিহাস প্রণেতারা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে একে কোনভাবেই উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বের সময়কালে স্থাপন করা যায়না।ঔপনিবেশিক শাসন সুদৃঢ় হয়ে চেপে বসবার সাথে সাথেই ইংরেজদের আনুকূল্যে বাংলাদেশে ইংরেজী ধরণের রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হল।এই থিয়েটারগুলিতে ইংরেজ অভিনেতারা ইংরেজী নাটকের অভিনয় করতেন।দর্শক হিসেবে বাঙালীর সেখানে প্রবেশাধিকার ছিলো না।এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতেই যেখানে নবজাগরণের আলোকপুষ্ট শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে ইংরেজী নাটকের প্রতি আগ্রহ দেখা দিলো।এটা সম্ভব হয়েছিল ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের ফলেই।ক্রমে এই আগ্রহই প্রজন্মবাহিত হয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্ম দিয়েছিল ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে,যেখানে সকল শ্রেণীর বাঙালী দর্শক সর্বপ্রথম দর্শনীর বিনিময়ে বাংলা নাট্যের আস্বাদন লাভ করতে সমর্থ হলেন।এর পূর্বের কয়েকটি দশক জুড়েই ধনী

বাঙালীর প্রাসাদমঞ্চে বাংলা নাটকের অভিনয় অবশ্য শুরু হয়েছিল,তবে সর্বস্তরের মানুষের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিলোনা।এই পর্বের নাট্যপ্রচেষ্টাগুলিকে আমরা 'সখের থিয়েটার' বলে চিহ্নিত করি।সখের থিয়েটারের সাফল্য এবং তার সীমাবদ্ধতাগুলিই পরবর্তীকালে জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় ইন্ধন যুগিয়েছিল,এবিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারেনা।

কিন্তু এই আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগে এই কথাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে প্রাচীন বাংলা তথা ভারতবর্ষে নাটক রচনা এবং তার অভিনয় অপ্রচলিত ছিলোনা।বহু পূর্ব থেকেই আমাদের একটি দেশজ নাট্যকলার অস্তিত্ব ছিল।সংস্কৃত নাটক এবং তার বিশিষ্ট অভিনয়ে তৎকালীন রাজন্যবর্গ এবং অভাজাতরা অকুণ্ঠ সহযোগিতা করতেন।প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টিয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত নাটকের গৌরবের সুবর্ণযুগ।কালিদাস,ভাস,বিশাখদত্ত,শূদ্রক,ভবভূতির নাট্যরচনা শুধুমাত্র সেযুগেই নয়,বর্তমানেও রসবেত্তাদের দ্বারা একইভাবে সমাদৃত হয়ে চলেছে।ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে আমাদের দেশীয় নাট্যরীতিটির বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়।এই গ্রন্থটি নাট্যাভিনয় এবং নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে আকরগ্রন্থ হিসেবেই বহুল চর্চিত।সংস্কৃত নাটকের গৌরবকাল স্থায়ী হয়েছিল একাদশ-দ্বদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইসলাম বিজয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হওয়ার পূর্বের সময় পর্যন্ত।দ্বাদশ শতকে মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের পূর্বেই সংস্কৃত নাটকের প্রাণশক্তি স্তিমিত হয়ে এসেছিল।এর পরবর্তীতে পরম্পরাবাহিত লোকনাট্যে,নৃত্য-গীতের ধারাটি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিজের মধ্যে সমাহৃত করে নিয়ে বেঁচে রইলো।সেন বংশের পতনের পরে বাংলাদেশেও নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের কোন বিবরণ পাওয়া যায়না।তবে এখানেও দেশজ লোকনাট্যকলা মাটির গভীর থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করবার দরুণ বিভিন্নভাবে লোকরুচিকে তৃপ্ত করেছে।কেউ কেউ আধুনিক বাংলা নাটকের উৎস সন্ধানে এই লোকনাট্যকলা,যাত্রা প্রভৃতির প্রভাবকে স্বীকৃতি দিতে চাইলেও অধিকাংশ সমালোচকের মতে আধুনিক রঙ্গালয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা মূলত গড়ে ওঠে ইংরেজী থিয়েটার

এবং নাট্যরীতিকে কেন্দ্র করেই।পরবর্তীতে আমরা সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হবো।

৩.২ নাটক এবং মঞ্চব্যবস্থা

নাটক একটি মিশ্রশিল্প।সুতরাং সাহিত্যমূল্য ব্যতিরেকে তার আরেকটি গুরুত্ব রয়েছে,যা হল তার থিয়েট্রিক্যাল ভ্যালু।অভিনীত না হলে কোন নাট্যকর্মই সম্পূর্ণতা লাভ করেনা।নাটক অভিনয়ের জন্যই লেখা হয়।প্রত্যেকটি অভিনয়ের সঙ্গে সর্বতোভাবে জড়িয়ে থাকে মঞ্চব্যবস্থা।তাই যে কোন অভিনয়কর্মে মঞ্চব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।যিনি নাটকের রচনাকর্তা তিনি কোনমতেই এই প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন না।আবার এই মঞ্চব্যবস্থার প্রকৃতি যুগে যুগে বদলায়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে মঞ্চব্যবস্থা বলতে আমরা কী বুঝি?খুব সাধারণ অর্থে বোঝাতে হলে বলা যায় রঙ্গমঞ্চে একটি নাটকাভিনয়ের প্রয়োজনে যে সমস্ত উপাদানগুলির একত্রীকরণ জরুরী,সামগ্রিকভাবে তার সবকিছুই মঞ্চব্যবস্থার অন্তর্গত।অর্থাৎ স্টেজ বা রঙ্গমঞ্চ,সেট-সেটিংস,উইংস,দৃশ্যসজ্জা,রূপসজ্জা,আলোক প্রক্ষেপণ,আবহ নির্মাণ,অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দক্ষতা,পরিচালকের মুন্সিয়ানা,এমনকি যিনি অর্থলগ্নি করেন সেই প্রযোজকের উদ্দেশ্য,সদিচ্ছা ও দর্শকমন্ডলী এবং তাদের অভিরুচি - এই সবকিছু নিয়েই একটি যুগের মঞ্চব্যবস্থা গড়ে ওঠে।নাট্যকার সেই প্রেক্ষালয় পরিমণ্ডলটির দ্বারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েই নাটক রচনায় অগ্রসর হন।

এখন এই কথা সহজেই অনুমেয় যে কোন যুগের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস সেই যুগের নাট্যরুচি এবং নাটকাভিনয় - এই সমস্ত উপাদানগুলি একে অন্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে।নাটক সংক্রান্ত আলোচনায় এই ধারণার স্বচ্ছতা আবশ্যিক।মঞ্চব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে নাট্যকারের কৃতিত্ব বিচার কিংবা নাটক এবং তার অভিনয়ের প্রসঙ্গ আলোচনায় সে যুগের নাট্যরুচি ও যুগচাহিদাকে অস্বীকার করা,কোনটাই যথার্থ নয়।

বাংলা নাটক তার জন্মলগ্ন থেকেই যুগপ্রয়োজনকে স্বীকৃতি দিয়েছে।শুধুমাত্র মঞ্চে অভিনীত হওয়ার চাহিদা থেকেই নাট্যকারেরা নিরলসভাবে নাটক রচনা করে গিয়েছেন।এক্ষেত্রে সমকালীন সমাজের উচ্চবিত্তরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।কিন্তু তারও পূর্বে রুশদেশীয় গেরাসিম স্তেপানোভিচ্ লেবেডেফ ব্রিটিশদের পাশাপাশি ইংরেজী ধরণের রঙ্গালয়ে প্রবেশাধিকারহীন বাঙালী দর্শকের কথা স্মরণ করেই The Bengally Theatre-এর নির্মাণে যত্নবান হয়েছিলেন।এখানে তাঁর উদ্যোগে যে দুটি নাটকের অভিনয় সম্ভব হয়েছিল সে সম্পর্কে লেবেডেফ নিজে বলছেন -

"I translated two english dramatic pieces, namely The Disguise and Love is the Best Doctor,into the Bengali language;and having observed that the Indians preferred mimicry and drollery to plain grave solid sense; however purely expressed - I therefore fixed on those plays, and which were most pleasantly filled up with a group of watchmen, chokeydars, savoyards, canera, thieves, ghoonia, lawyers, gumosta and among the rest a corps of petty plunderers." [A Grammer of the pure and Mixed East Indian Dialecs, 1801]

- সুতরাং নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে লেবেডেফ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাঁর পারিপার্শ্বিক ইংরেজ ও বাঙালী দর্শকের রুচি এবং প্রবণতা অনুযায়ী।এই কারণেই তাঁর নাট্য-পরিবেশনাগুলি তৎকালীন পূর্বদেশীয় বাণিজ্যকেন্দ্র কলকাতায় জনসমাদর লাভ করেছিল।

ধনী বাঙালীর প্রাসাদ-মঞ্চে যে সমস্ত নাটকের অভিনয় সম্ভব হয়েছিল,তার অধিকাংশতই বিত্তবান মালিকের রস-রুচির ওপর নির্ভরশীল ছিল।সখের নাট্যশালায় দর্শক সংখ্যা যেমন নিয়ন্ত্রিত ছিল তেমনই অর্থ-ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন কার্পণ্য পরিলক্ষিত হয়নি।ফলে সম্পদের প্রাচুর্য,জৌলুস,জাঁকজমক প্রকাশের বাহন হয়ে ওঠে নাটকগুলি।নাট্যকারকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করার রীতি তাঁদের আরো বেশী করে

নাটক রচনায় উৎসাহিত করেছিল।একজন নাট্যকার কীভাবে তাঁর যুগের প্রেক্ষালয় পরিমণ্ডলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন,তার পরিচয় আমরা এই পর্বেও প্রত্যক্ষ করি।মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো মহাকবির পক্ষেও সে প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।আমরা সকলেই জানি বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য নাটক রচনাতেই মধুসূদনের নাট্যকার জীবনের প্রারম্ভ।এই মঞ্চে অভিনীত 'রত্নাবলী' নাটকের দৃশ্যপট,সাজসজ্জা এবং অভিনেতাদের অভিনয়সাফল্যের ওপর নিরভর করেই তিনি 'শর্মিষ্ঠা'র মতো নাটক রচনা করেছেন।পাশ্চাত্য প্রভাব স্বীকার করে নাটক রচনা করতে চাইলেও,কেবলমাত্র রঙ্গমঞ্চের বিত্তবান উৎসাহদাতার জন্য মধুসূদনকে 'হিন্দু ড্রামা' রচনা করতে হয়েছে যা অনেকাংশেই সংস্কৃত নাট্যানুসারী।পরবর্তীতে তাঁর যে সমস্ত নাটকে তিনি সমাজকে বিদ্ধ করেছেন,বেলগাছিয়া নাট্যশালা তাদের অভিনয় থেকে বিরত থেকেছে।ফলত মধুসূদনের নাট্যকার জীবনের সিদ্ধি এবং সীমাবদ্ধতা হয়ে দাঁড়িয়েছে তৎকালীন প্রেক্ষালয় পরিমণ্ডল।আবার সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজনের মধ্যেই ছিল সামাজিক বিন্যাস এবং চিন্তার পরিবর্তনের ইঙ্গিত।দর্শনী মূল্য দিয়ে নাটক দেখতে আসা বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শক এসময় থিয়েটারকে ভরিয়ে রেখেছেন।তাদের সকলের প্রবণতা একইরকম ছিলো না।তারা নানা ভাবের নাট্যরস আস্বাদন করতে চেয়ে অকৃত্রিম উৎসাহের বশেই থিয়েটারে এসেছেন।ফলে এসময় নাট্যনির্মাণের সামগ্রিক পরিসরে একটা বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়েছিল।দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যকার হিসেবে খ্যাতির প্রসার মূলত এই সময়েই।তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকটি ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে রচিত হলেও তার প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে,ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে।এরপর অভিনয়ে পাকাপাকিভাবে অভিনেত্রী গ্রহণ করা হয়,যার ফলে শিক্ষিত,রুচিশীল দর্শক রঙ্গমঞ্চ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকে।তার বদলে সাধারণ বাঙালী দর্শক,যারা মূলত থিয়েটারে আমোদ-প্রমোদ,দীর্ঘদিনের যাত্রার রস,ভাব ও আবেগের যুগপৎ মিশ্রণ প্রত্যাশা করেছেন,রঙ্গালয়ে তাদের যাতায়াত বাড়তে থাকে।অন্যদিকে 'নীলদর্পণ' নাটকাভিনয়ের পর থেকে নাটকে সামাজিক শোষণ এবং অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশ পেতে থাকে,একইসাথে জাতীয়

ভাবোদ্দীপক,স্বদেশানুরাগের নাটক রচনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।এই পরিস্থিতিকে প্রশমিত করতে ১৮৭৬ সালে 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন'-এর অবতারণা যা পরবর্তী দুই দশকের বেশী সময়ব্যাপী রঙ্গমঞ্চে বাঙালীর গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল।গিরিশচন্দ্র ঘোষ,অমৃতলাল বসু,রাজকৃষ্ণ রায়ের মতো শক্তিমান নাট্যকারেরাও সমকালীন যুগ-পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে নাটক লিখতে বাধ্য হয়েছেন।পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পুনরায় স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় ভাবোদ্দীপনামূলক নাটক রচনা গতি পায়।ডি.এল রায়,ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখের নাটক এসময় বাংলার নাট্যমঞ্চগুলিকে অধিকার করে রাখে।আসলে বাংলাদেশে সার্থক প্লে-রাইটের অভাব কখনোই অনুভূত হয় নি।এখানকার সমস্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকারই প্লে-রাইট।এবিষয় অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই যে মঞ্চের প্রভাবাধীন থেকে নাটক লিখলেও বহুক্ষেত্রে মঞ্চের প্রয়োজনকে অতিক্রম করতে পেরেছেন বলেই তাঁরা সফল নাট্যকার।মধুসূদন,গিরিশ ঘোষ,ডি.এল রায় সকলকেই আমরা এই শ্রেণীভুক্ত করতে পারি।রবীন্দ্রনাথও প্রাথমিকভাবে সাধারণ রঙ্গালয়ের উপযোগী নাট্যনির্মাণে ব্রতী হয়েছেন।পরবর্তীতে শান্তিনিকেতন পর্ব থেকে তাঁর স্বতন্ত্র থিয়েটারভাবনার অস্তিত্ব প্রকাশ পেতে থাকে।১৯২৯ সালে রূপান্তরিত 'তপতী' নাটকে তাঁর নিজস্ব মঞ্চভাবনার সমান্তরালে ক্রিয়া করতে থাকে সাধারণ রঙ্গালয়ের দৃশ্যপট ভাবনা।সব শেষে প্রখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ'-এর একটি মন্তব্যকে উদ্ধৃত করে এই সংক্রান্ত আলোচনায় ইতি টানবো যেখানে মঞ্চব্যবস্থা এবং তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্লে-রাইটের এক তীক্ষ্ণ স্বীকারোক্তি এবং আত্মবিশ্লেষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে -

"I have to think of my pocket, of the manager's pocket, of the spectators pocket.It is these factors that decide the playwright's method leaving him so little room for selection."

৩.৩ কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়ের সূচনা

কলকাতার বুকে প্রথম রঙ্গালয় স্থাপিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে।পলাশীর যুদ্ধ সমাসন্ন,ইংরেজ বণিকশক্তির রাজশক্তি হিসেবে ক্ষমতাদখল আর

কিছু সময়ের অপেক্ষা।বাণিজ্যকেন্দ্র কলকাতায় বসবাসকারী অল্পসংখ্যক ইংরেজ নিজেদের আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ হিসেবে থিয়েটার হল তৈরীর উদ্যোগ নেয়।প্রথমে তারাই অ্যামেচার হিসেবে অভিনয়ে অবতীর্ণ হয়।পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড থেকে নট-নাট্যকারের আবির্ভাবে রঙ্গালয়গুলিতে অভিনয় চলতে থাকে।এই রঙ্গালয়গুলির নাটক,সাজসজ্জা,যন্ত্রানুষঙ্গ,সঙ্গীত থেকে অভিনয়রীতি সবই ছিল বিদেশী।তাই এই রঙ্গালয়গুলিকে 'বিদেশী রঙ্গালয়' হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়।মূলত অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত একাধিক এরকম রঙ্গালয় কলকাতায় গড়ে উঠেছে যার প্রথম নিদর্শন ছিল ওল্ড প্লে হাউস।১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত এই রঙ্গালয়টি ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার কলকাতা আক্রমণের সময় ধ্বংস হয়ে যায়।বর্তমানে লালবাজার স্ট্রিটের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেন্ট এন্ড্রুজ গির্জার অপর পারে এটি তৈরী হয়।এই রঙ্গালয় এবং তার সংলগ্ন একটি নাচঘরের পরিচয় মিস্টার উইলের আঁকা ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দের কলকাতার মানচিত্রে ও পাওয়া যায়।সংবাদপত্র না থাকার দরুণ এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের কোন বিবরণ পাওয়া যায়নি।

ক। দি নিউ প্লে-হাউস বা ক্যালকাটা থিয়েটারঃ এই থিয়েটারটির প্রতিষ্ঠাতা জর্জ উইলিয়ামসন।১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এই রঙ্গালয়টি নির্মাণ করেন।কলকাতার বুকে এই থিয়েটারটিতে প্রায় তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে নাট্যাভিনয় চলেছিল।সম্ভ্রান্ত ধনী ইংরেজরা এই থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।বিখ্যাতদের মধ্যে হেস্টিংস,বারওয়েল,স্যর এলিজা ইম্পে প্রমুখদের নাম স্মরণ করা যায়।শোনা যায় যে এই রঙ্গালয়টির নির্মাণে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছিল।ইংল্যান্ড থেকে আগত শিল্পী বার্নার্ড মেসিংকের নির্দেশানুসায়ী দৃশ্যপট নির্মিত হয়।সেই যুগে ইংল্যান্ডের যে কোন প্রথম শ্রেণীর রঙ্গালয়ের আদলেই এটি গড়ে উঠেছিল।এখানে অভিনেতারা সকলেই ছিলেন অ্যামেচার।শেক্সপীয়র,বেন জনসন,ফিলিপ ম্যাসিঞ্জার টমাস অটওয়ে,সেরিডান প্রমুখ নাট্যকারদের নাটক অভিনয়ে এই থিয়েটারটি বিশেষ গৌরব অর্জন করে।পরবর্তীকালে দর্শক স্বল্পতার কারণে লঘুচপল নাটকের অভিনয় এই গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেছিল।দীর্ঘ তেত্রিশ বছর অভিনয়ের পর ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে নাট্যালয়টি

বন্ধ হয়ে যায়।ইংল্যান্ডের বিখ্যাত অভিনেতা ডেভিড গ্যারিকের উপদেশ এবং সাহায্য,অভিনেতাদের অভিনয়ের উচ্চমান,নৃত্যগীতে পারদর্শিতা ক্যালকাটা থিয়েটারের সুনাম বর্ধিত করেছিল।বন্ধ হয়ে যাবার পর রাজা গোপীমোহন ঠাকুর রঙ্গালয়টি কিনে নিয়ে সেখানে বাজার প্রতিষ্ঠা করেন।

অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য -

১. এই থিয়েটারেই সর্বপ্রথম 'Subscription Performance' প্রথা শুরু হয়।টিকিট বিক্রির পূর্বেই সদস্য-দর্শক নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ফলে দর্শকাসন খালি থাকতো না।

২. নারীচরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করতেন।পরবর্তীকালে নারীরাও নাটকে অংশগ্রহণ করতে থাকেন।

৩. গভীরনগম্ভীর বিয়োগান্ত নাটকের পাশাপাশি এখানে লঘু প্রহসনেরও ব্যবস্থা ছিল।

৪. প্রথমদিকে এই থিয়েটারটিতে ভারতীয় দর্শকদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

৫. পিটসীটের মূল্য ছিল আট সিক্কা টাকা।বক্সের প্রবেশমূল্য ছিল এক মোহর।Subscription Performance এর নিয়মে ১২০ টাকার টিকিটে একজন পুরুষ ও তার বাড়ির মহিলারা মোট ছয়টি নাটক দেখতে পেতেন।

৬. কোম্পানীর কোন কর্মচারী অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে পারতেন না।

খ। মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটারঃ মিসেস ব্রিস্টোর প্রকৃত নাম Emma Wrangham, তাঁর সম্পর্কে জানা যায় যে তিনি অসামান্যা সুন্দরী এবং নৃত্যকুশলিনী ছিলেন।তাঁর স্বামী কলকাতার সিনিয়র মার্চেন্ট জন ব্রিস্টো।জন ব্রিস্টোর সাথে বিবাহের পরই তিনি থিয়েটারে পদার্পণ করেন।তাঁদের চৌরঙ্গীর বাড়িতে ১লা মে,১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে রঙ্গমঞ্চটির উদ্বোধন হয় জনপ্রিয় সংগীতবহুল 'পুওর সোলজার' নাটকটির অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে।এছাড়া এখানে সুলতান প্যাডলক নাটক অভিনীত হয়।'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকায় এই রঙ্গালয়ের অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়।মিসেস ব্রিস্টোর থিয়েটারে ভালো পরিমাণে দর্শক সমাগম ঘটতো।অভিনেত্রীকে নিয়ে সেসময় কলকাতার

ইংরেজদের মধ্যে বেশ উন্মদনা দেখা যায়।এই থিয়েটারটি মাত্র এক বছর চলার পরে ১৭৯০ সালে বন্ধ হয়ে যায়।

অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য -

১. এই থিয়েটারটি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত প্রথম ইংরেজী থিয়েটার।

২. এখানেই প্রথম মহিলারা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

৩. নারীচরিত্রের পাশাপাশি পুরুষ চরিত্রেও মেয়েরাই অভিনয় করেন।

গ। হোয়েলার প্লেস থিয়েটারঃ এই থিয়েটারটি ২১শে ফেব্রুয়ারি,১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে অভিজাত ইংরেজদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।এখানে সাধারণ দর্শকের প্রবেশাধিকার ছিলনা।এই থিয়েটারেও Subscription প্রথা চালু করা হয়েছিল।এই থিয়েটারের প্রবেশমূল্য ছিল এক মোহর।পরবর্তীতে যদিও দর্শনীমূল্য কিছুটা কমানো হয়।এখানে প্রথম অভিনীত হয় 'দি ড্রামাটিস্ট' নামক প্রহসন।এছাড়া 'সেন্ট প্যাট্রিকস ডে','থ্রি উইকস আফটার ম্যারেজ','ক্যাথেরিন অ্যান্ড প্যাট্রিসিও','দি মোগল টেল' প্রভৃতি বিভিন্ন নাটক-অপেরা অভিনয়ের পর ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে এই থিয়েটারটি বন্ধ হয়ে যায়।

ঘ। এথেনিয়াম থিয়েটারঃ ১৮নং সার্কুলার রোডের ওপরে এই থিয়েটারটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে,ক্যালকাটা থিয়েটার বন্ধ হওয়ার প্রায় সাড়ে তিন বছর পর।প্রতিষ্ঠাতা মি.মরিস ছিলেন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী।থিয়েটারটির উদ্বোধনের দিন,সোমবার,৩০শে মার্চ(১৮১২) পরপর দুটি নাটকের অভিনয় হয়।সমস্ত দর্শকাসন ছিল পূর্ণ।দুটি নাটকের মধ্যে 'আর্ল অফ এসেক্স' বিয়োগান্ত ধরনের এবং তার পরে অভিনীত নাটক 'রেজিং দি উইণ্ড' ছিল প্রহসন।এখানে শেক্সপীয়রসহ অন্যান্য নাট্যকারদের গভীর রসাত্মক নাটকগুলিও অভিনীত হয়েছিল।যদিও শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডিগুলির অভিনয়ে এরা সাফল্য লাভ করতে পারেনি।সামান্য কয়েক বছরের মধ্যেই আর্থিক লোকসানের কারণে রঙ্গালয়টির মালিকানা বারবার হাতবদল হয়।১৮১৪ সালে মি.মরিস পুনরায় থিয়েটারটি ক্রয় করে নাটকাভিনয়ের প্রচেষ্টা চালান।'হ্যামলেট', ও একটি হালকা

চালের প্রহসন ছাড়াও সেই বছরের শেষের দিকে মি.মরিস এখানে তিনটি নাটকের অভিনয় আয়োজন করেন।এরপর এই থিয়েটারের যাবতীয় প্রচেষ্টা শেষ হয়ে যায়।ততদিনে চৌরঙ্গী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে এথেনিয়ামের দর্শকসংখ্যা স্তিমিত হয়ে যায়,ফলে প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এই রঙ্গালয়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য -

১.এই থিয়েটারে ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রীর অনুপস্থিতির কারণে ভালো নাটকের সুচারু অভিনয় সম্ভব হয়নি।অন্যদিকে চৌরঙ্গী থিয়েটারে অভিনয়ের মান এতটাই উন্নত ছিল যে অধিকাংশ দর্শক সেদিকেই আকৃষ্ট হয়।

২. শেষের দিকের অভিনয়গুলিতে কেরাণী,ভাঁড়,সৈনিক,নাবিক,কৌঁসুলি প্রভৃতি বিচিত্র প্রকৃতির চরিত্র সমাবেশের দ্বারা আকর্ষণ সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

ঙ। চৌরঙ্গী থিয়েটারঃ ক্যালকাটা থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার ফলে কলকাতায় উচ্চমানের ইংরেজি নাটকের অভিনয়ে অভাববোধ অনুভূত হতে থাকে।এই মঞ্চের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন রুচিশীল,সম্ভ্রান্ত,শিক্ষিত ইংরেজ নাট্যরসিকেরা।একইসাথে আধুনিকমনা কতিপয় বাঙালী অভিজাতকেও এই উদ্যোগে সামিল হতে দেখা যায়।মূলত অ্যামেচার ড্রামাটিক সোসাইটির উদারমনা ইংরেজরা মিলেই এই রঙ্গালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন।প্রখ্যাত পণ্ডিত স্যর হোরেস হেম্যান উইলসন,হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি.এল রিচার্ডসন,প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সহযোগী হেনরি মেরিডিথ পার্কার,জে.এইচ স্টোকলার এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বয়ং এই থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নিজেদের ভূমিকা পালন করেছেন।

১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর এই থিয়েটারটির যবনিকা উত্তোলিত হয়।প্রথম অভিনয়-রজনীতেই 'কাসল স্পেক্টার' নামে একটি বিয়োগান্ত এবং 'সিক্সটি থার্ড লেটার' নামক একটি অপেরা অভিনীত হয়।বড়লাট লর্ড ময়রা,তাঁর স্ত্রী এবং নানান বিখ্যাত নাট্যরসিকজনের আবির্ভাবে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে যায়।

এই থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই ছিলেন উচ্চাঙ্গের অভিনয় দক্ষতা সম্পন্ন।অভিনেতারা ছিলেন অ্যামেচার।তবে অভিনেত্রীরা সকলেই রঙ্গালয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত,পেশাদার ছিলেন এবং উচ্চহারে বেতন পেতেন।এই থিয়েটারের পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী করতেন Ranken & Co.-এর মতো বিখ্যাত সংস্থা।ইংল্যান্ড থেকে কিছু বিখ্যাত অভিনেত্রীদের এখানে আনা হয়েছিল।এঁদের মধ্যে মিসেস এটকিনসন,মিসেস চেস্টারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।নৃত্যগীত ও অভিনয়ে পারদর্শিনী এই অভিনেত্রীরা চৌরঙ্গী থিয়েটারের আকর্ষণ ছিলেন।তবে সে যুগের অপ্রতিদন্দ্বী শিল্পী ছিলেন মিসেস এসথার লীচ।তাঁর অভিনয় নৈপুণ্য এতটাই আশ্চর্যেরছিল যে তাঁকে এই দেশে 'ইন্ডিয়ান সিডানস' নামে ডাকা হতো।সেরিডানের সুপরিচিত নাটক 'স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল'-এ লেডি টিজেলের ভূমিকায় তিনি প্রথম মঞ্চে অবতীর্ণ হন।১৮২৬ থেকে ১৮৩৮ পর্যন্ত 'ওথেলো','দি ওয়াইফ','লেডি অফ লায়ন্স' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে তিনি চৌরঙ্গী থিয়েটারের সুনামকে বর্ধিত করেন।

বিপুল জনসমাদর এবং দর্শকানুকূল্য সত্ত্বেও এই থিয়েটারটি বারবার নানা প্রতুবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।প্রথম বছরেই ১৭ হাজার টাকার দেনার ধাক্কায় থিয়েটারটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।শেষ পর্যন্ত ১৮৩৩ সালে কর্তৃপক্ষ এক ইতালিয়ান অপেরা কোম্পানীকে থিয়েটারটি ভাড়ায় প্রদান করে।এরপরে আরো একবার হাতবদল হয়ে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে থিয়েটারটি নীলামে ওঠে।থিয়েটারটি ক্রয় করেন দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বয়ং।মালিকানার লোভে নয়,বরং থিয়েটারটিকে দুরবস্থা থেকে বাঁচানোর আন্তরিক তাগিদেই তিনি থিয়েটারটি ক্রয় করেন।নীলাম থেকে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থে যাবতীয় দেনা পরিশোধিত হওয়ার পরে চৌরঙ্গী থিয়েটারে পুনরায় অভিনয় শুরু হয়।এরপরে মীসেস লীচ অসুস্থ হয়ে লণ্ডন ফিরে যান।অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভাব,দেনা,অবহেলা সমস্ত কিছুকে শিরোধার্য করেই চার বছর পরে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩১শে মে অকস্মাৎ আগুন লেগে থিয়েটারটি ভস্মীভূত হয়ে যায়।এরপরে এখানে আর অভিনয় সম্ভব হয়নি।

অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য -

মন্তব্য

১. এখানে শেক্সপীয়র থেকে শুরু করে সেরিডান,গোল্ডস্মিথ,কোলম্যান,নোয়েলস,ফ্লেচার প্রমুখ খ্যাতিমান নাট্যকারদের নাটক অভিনীত হয়েছে।১৮২৪ সালের নভেম্বরে এই মঞ্চে শেক্সপীয়রের হেনরি দি ফের্থ নাটকটি অভিনীত হয়।এই অভিনয়ের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সে সময়ের পত্রিকায় একজন সাধারণ দর্শকের মন্তব্যকে স্মরণ করা যেতে পারে -

"It was,in a word,a splendidly executed picture,and every feature and hue of which was in the most excellent taste and keeping.Falstaff,we need scarcely say,was done in a style of the most matchless kind.We have seen some one or two stars at home attempt the character,but we never beheld Skakespeaere's Falstaff - until we saw him embodied as in Friday night."

- এই সময় ছিল মূলত হৈ-হুল্লোড় এবং আমোদ-প্রমোদের।সুস্থ রসবোধ তখনও দর্শকদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি, সেই বিবরণও আমরা পত্রিকার বিবরণ থেকে জানতে পারি।

২. এখানে ইংল্যান্ডের মঞ্চের আদর্শে অভিনয় প্রচলিত ছিল।সাজসজ্জা,পোশাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্যের সাথে আলোর সুবন্দোবস্তও এই থিয়েটারের সম্পদ ছিল।গ্যাসের আলোর প্রচলন এবং বিশেষ মুহূর্তে আলোক নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা ছিল।

৩. দৃশ্যপট ছিল নতুন,উজ্জ্বল এবং বর্ণময়।নাটকের বিষয় বৈশিষ্ট্যের নিরিখেও চৌরঙ্গী থিয়েটার বাকি রঙ্গালয়গুলিকে পিছনে ফেলেছিল।

৪. বাঙালী হিসেবে দ্বারকানাথ ঠাকুর এর পরিচালকমণ্ডলীতে উপস্থিত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে মালিকও হয়েছেন।এই ঘটনা ভারতীয়-ইংরেজ সম্পর্কের ক্রমবিবর্তনের দিকটিকেও ইঙ্গিত করে।

৫. সর্বোপরি হিন্দু কলেজের সঙ্গে যুক্ত রিচার্ডসন এবং এইচএইচ উইলসনের উপস্থিতির প্রভাবে বাঙালি তরুণ ছাত্রেরা ইংরেজী নাট্যের আস্বাদনে আগ্রহী হয়,যা পরবর্তীকালে বাঙালীর নাট্যমনন নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

চ। সাঁ সুসি থিয়েটারঃ চৌরঙ্গী থিয়েটার ভস্মীভূত হওয়ার বছরেই কলকাতায় আরো একটি প্রথম শ্রেণীর থিয়েটার স্থাপিত হয়।ওয়াটারলু স্ট্রিট ও গভর্ণমেন্ট হাউস ইস্টের কোণে থ্যাকার কোম্পানীর বইয়ের দোকানের নীচের হলটিতে প্রথমে একটি অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী হয়।এই মঞ্চে 'ইউ কান্ট ম্যারি ইওর গ্র্যান্ডমাদার' নাটকের সঙ্গে 'বাট হাউএভার' এবং 'মাই লিটল অ্যাডপ্টেড' প্রহসনদুটির অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সাঁ সুসি থিয়েটারের সূচনা হয়*(২১শে আগস্ট,১৮৩৯)*।অভিনেতা ও ইংলিশম্যান কাগজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জে.এইচ স্টোকলার এবং প্রখ্যাতা অভিনেত্রী মিসেস লীচ ছিলেন এই থিয়েটারের প্রধান উদ্যোক্তাদ্বয়।রঙ্গমঞ্চটি ছোট হলেও সুদৃশ্য এবং মনোরম ছিল জানা যায়।প্রায় চারশো দর্শকাসন বিশিষ্ট হলটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিয় ছিল।এই রঙ্গালয়ের সবকিছু নির্মাণ ও প্রস্তুতির দায়িত্বে ছিলেন মি.বলিন ও মি.বার্টলেট।প্রথম রজনীর অভিনয়ে প্রেক্ষাগৃহের দর্শকাসন পূর্ণ হয়েছিল বলে জানা যায়।

এরপর মিসেস লীচের উদ্যোগেই স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণের তৎপরতা শুরু হয়।অস্থায়ী মঞ্চের ব্যবহারের সব সরঞ্জাম এবং সম্পত্তি তিনি স্থায়ী মঞ্চের জন্য প্রদান করেন।পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বড়োলাট অকল্যান্ডের পাশেই জায়গা করে নিয়েছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর।তাঁরা উভয়েই এক হাজার টাকা করে দান করেন।

পার্ক স্ট্রীটে জমি সংগ্রহের পর সেখানেই রঙ্গালয়টি নির্মিত হয়।লন্ডনের বিখ্যাত শিল্পী জেমস ব্যারী ও তাঁর স্ত্রী,লণ্ডনের অ্যাডেলফি থিয়েটারের মিসেস ডীকল ও মিস কাউলি এই থিয়েটারে যোগদান করেন।যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহারে এবং উপযুক্ত শিল্পীদের ওপর দৃশ্যপট নির্মাণের ভার ন্যাস্ত ছিল,যা অভিনয়ের আকর্ষণকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিল।

৬ই মার্চ,১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে স্থায়ী মঞ্চের উদ্বোধন হয় 'দি ওয়াইফ' নাটকের মধ্যে দিয়ে।অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন মিসেস লীচ,হিউম,হাওয়ার্ড,স্টোকলার

প্রমুখেরা।এরপর অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত অভিনেত্রী মাদাম দেরম্যাঁভিয়ে সহ লণ্ডনের আরো কয়েকজন নামী অভিনেতা-অভিনেত্রী যোগ দেওয়ার ফলে এই থিয়েটারের গৌরব ব্যাপকভাবে বর্ধিত হয়।ড্রুরিলেন থিয়েটারের প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা জেমস ভাইনিং এখানে যোগদান করে 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকে শাইলকের ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় করেন।একইসাথে 'হ্যান্ডসাম হাজব্যান্ড' নাটকটিএ দর্শকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে।এই নাটকের অভিনয়কালে ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর মিসেস লীচের বস্ত্রপ্রান্তে আগুন লাগার ফলে তিনি অগ্নিদগ্ধ হন,এবং ১৮ই নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।মৃত্যুর আগে তিনি সাঁ সুসির মালিকানা প্রদান করেন অভিনেত্রী মাদাম নিনা ব্যাক্সটারকে।তাঁর মালিকানায় এই থিয়েটারে 'স্ট্রেঞ্জার','ম্যাকবেথ','রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট','হ্যামলেট','রাইভ্যালস','রেজিং দি উইন্ড' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় সংসাধিত হয়।

নতুনভাবে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এনে অভিনয় বজায় রাখতে চাইলেও ক্রমাগত দেনার কারণে সাঁ সুসি থিয়েটার বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।এর ওপর মিসেস ডীকল,চার্লস ভাইনিং ছেড়ে দেওয়ার ফলে থিয়েটারটির আকর্ষণ অনেকটাই কমে যায়।এখানে ঘোড়ার খেলা দেখাবার ব্যবস্থাও করা হয়,যা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।যাই হোক নিনা ব্যাক্সটারের থেকে রঙ্গমঞ্চটি হস্তান্তরিত হয় জেমস ব্যারীর কাছে।অভিনয় প্রায় হতোই না।জেমস ব্যারী,মিসেস ব্যারী এবং মিসেস ফ্রান্সিস ছাড়া কোন দক্ষ অভিনেতাও অনুপস্থিত ছিলেন।শেষ চেষ্টা হিসেবে লন্ডন থেকে মিসেস লীচের সুযোগ্যা কন্যা মিসেস এন্ডারসনকে নিয়ে এসে 'ওথেলো' নাটকটি অভিনয়ের আয়োজন করা হয়।ডেসডিমোনার চরিত্রে তাঁর অসামান্য অভিনয়ের প্রশংসা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে।এই নাট্য প্রচেষ্টাটি অন্য একটি কারণেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।১৮৪৮ সালের ১৬ই আগস্ট অভিনীত এই নাটকে বৈষ্ণবচরণ আঢ্য নামে একজন 'নেটিভ জেন্টলম্যান' ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয় করলেন।এই ঘটনায় জনৈক পত্রপ্রেরক 'দ্য ক্যালকাটা স্টার' পত্রিকায় 'debut of a real unpainted niger Othello' মন্তব্যটি করলেন।পরবর্তীকালে বৈষ্ণবচরণ পুনরায় ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয়

করেছিলেন।তাঁর অভিনয়,চলাফেরা,অঙ্গভঙ্গি এবং ইংরেজী উচ্চারণ তৎকালীন বৃটিশ পত্রিকাতেও প্রশংসিত হয়েছিল।যদিও এর পরেও সাঁ সুসির দৈন্য দশা বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি।মিসেস এন্ডারসন এই থিয়েটার ত্যাগ করার পরে ১৮৪৯-এর ২১শে মে অভিনীত জেমস ব্যারীর ফেয়ারওয়েল নাটকটিই এই থিয়েটারের শেষ অভিনয়।

সাঁ সুসি থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়ের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে ছেদ পড়ে।যদিও পরবর্তীতে উনবিংশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত কয়েকটি বিদেশী থিয়েটার এবং অপেরা হাউস বাণিজ্যকেন্দ্র কলকাতার বুকে টিকে থাকতে পেরেছিল।কিন্তু খ্যাতি বা অভিনয়ের দিক থেকে তারা কেউই সাঁ সুসি বা চৌরঙ্গী থিয়েটারের সমকক্ষ ছিল না।

কলকাতায় বিদেশী রঙ্গমঞ্চগুলির অভিনয়রীতির দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে ইংল্যান্ডের থিয়েটারের আদর্শকেই অনুসরণ করতো।প্রথমদিকে এই ধরণের থিয়েটারে বাঙালী দর্শকের প্রবেশাধিকার না থাকলেও সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে এখানে বাঙালীর আবির্ভাব ঘটতে থাকে।দর্শক ছাড়াও ধনী বাঙালী নাটকের পৃষ্ঠপোষক রূপেও এগিয়ে আসেন।দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো মানুষ চৌরঙ্গী এবং সাঁ সুসি থিয়েটারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।এছাড়া শেষ পর্যন্ত বিদেশী থিয়েটারে এদেশীয় পুরুষের অভিনয় নাট্যমঞ্চের প্রতি বাঙালীর আগ্রহ এবং তৎপরতাকেই প্রকাশ করে।এক্ষেত্রে বিদেশী রঙ্গালয়গুলির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।এখানে অভিনয়ের সূত্র ধরেই নব্যশিক্ষিত তরুণদের মধ্যে নাটকাভিনয়ের ব্যাপারে উৎসাহ বাড়তে থাকে।অচিরেই অভিজাত বাঙালীর প্রাসাদমঞ্চে বাংলা নাটকের অভিনয় সম্ভব হয়।তাই বাংলা নাটকের বিবর্তনে বিদেশী রঙ্গমঞ্চের গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

৩.৪ অনুশীলনী

১. মঞ্চব্যবস্থা বা প্রেক্ষালয় পরিমন্ডল বলতে কী বোঝ?বাংলা নাটকের বিবর্তনে মঞ্চব্যবস্থার কতখানি ভূমিকা রয়েছে বর্ণনা কর।

২. কলকাতার বুকে স্থাপিত যে কোন পাঁচটি বিদেশী রঙ্গালয়ে অভিনয়ের বর্ণনা দাও।

মন্তব্য

৩. বাংলায় নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে চৌরঙ্গী এবং সাঁ সুসি থিয়েটারের গুরুত্ব কতখানি তা নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

৩.৫ গ্রন্থঋণ

১. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস - দর্শন চৌধুরী

২. বাংলা নাটকের বিবর্তন - সুরেশচন্দ্র মৈত্র

৩. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস - শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

৪. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর - অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৫. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস(১ম ও ২য়) - আশুতোষ ভট্টাচার্য

৬. ভারতীয় নাট্যমঞ্চ - হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

৭.বাংলা থিয়েটার - কিরণময় রাহা

একক ৪ - লেবেডেফ এবং তাঁর The Bengally Theatre

বিন্যাস ক্রম

৪.১ বাঙালীর যাত্রার ঐতিহ্য

৪.২ লেবেডেফ এবং তাঁর রঙ্গালয়

৪.৩ অভিনয়ের বর্ণনা

৪.৪ সীমাবদ্ধতা

৪.৫ গুরুত্ব

৪.৬ অনুশীলনী

৪.৭ গ্রন্থঋণ

৪.১ বাঙালীর যাত্রার ঐতিহ্য

মধ্যযুগে প্রকৃত অর্থে নাটকাভিনয়ের উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া গেলেও বাঙালীর অভিনয়-কলা লোকায়ত নৃত্য-গীত-নাটকের মাধ্যমকে অবলম্বন করে নিরবচ্ছিন্নভাবে টিকে রইল।এই লোকনাট্যের বীজ নিহিত ছিল বাঙালীর জাতীয় জীবনের গভীরে।তাই সামরিক অভিযান কিংবা রাজশক্তির পরিবর্তন কোনকিছুই এই ধারাকে প্রভাবিত করতে পারেনি।দেশজ অভিনয় রীতি ও প্রকরণকে আত্মস্থ করে নিয়ে লোকনাট্যের প্রাচীন আদর্শটি দেশের নানান প্রান্তে বারবার আত্মপ্রকাশ করেছে।বাঙালীর যাত্রা অভিনয়ের যে ঐতিহ্য তার উৎসমূল খুঁজে নিতে হলেও আমাদের সেদিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

আসলে 'যাত্রা' কথাটি যাওয়া অর্থেই ব্যবহৃত হয়।প্রাচীন যাত্রার রূপ কীরকম ছিল তা অনুমান করতে গিয়ে বলা হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে নৃত্য-গীত ও শোভাযাত্রার থেকেই যাত্রার উদ্ভব হয়েছে।ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোন দেবদেবীর বিগ্রহকে এক স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া বলতে যাত্রাই বোঝাত।আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞ যাত্রার প্রাচীনত্বকে বৈদিক যুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেখেছেন।বৈদিক যুগেও যাত্রার প্রচলনের বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোন দ্বিমত দেখা যায়না।তবে অনেকেই এই মতকে অগ্রাহ্য করেছেন।তাঁদের মতে ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে লোকায়ত নাটকের ধারাকে সংস্কার করে একটি আদর্শরূপ দিতে চেয়েছিলেন এবং তা সমাজের উচ্চতর অংশের মধ্যে গৃহীতও হয়েছিল।কিন্তু সেই সূক্ষ্ম ঋষিকল্প বৈদিক নাট্যের ধারাটি নিম্নতর জনসমাজের ক্ষেত্রে অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত হতে পারেনি।

অনেকে মধ্যযুগে প্রচলিত নাটগীতের মধ্যে যাত্রার উৎস খুঁজতে চেয়েছেন।দেবোৎসবে নৃত্য-গীত যা প্রথমে শোভাযাত্রা উপলক্ষেই আয়োজিত হতো,সেটির সঙ্গে অভিনয়ের লক্ষণগুলি যুক্ত হওয়ার ফলেই পরবর্তীকালে যাত্রার উদ্ভব ঘটেছে।জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ',বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রভৃতি সেসময় যেভাবে মুখে মুখে অনুকীর্তিত হতো তার মধ্যে নাটগীতের উপাদানগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

যাত্রার প্রাচীন রূপ যাই হোক না কেন বাংলাদেশে মূলত ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই এর উৎপত্তি।সেই ধর্মীয় আচার-আচরণের অনুষঙ্গেই যাত্রা আমাদের জীবনের আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল।তার একটি নির্দিষ্ট প্রথা এবং শৈলী গড়ে উঠলো।যে গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের মধ্যে থেকে যাত্রার প্রাচীন আঙ্গিকটি প্রাণরস সংগ্রহ করেছিল,উনবিংশ শতকে তার বহুলাংশে পরিবর্তন ঘটায় যাত্রার কাহিনীর মধ্যেও পরিবর্তন আসে।পুরোনো রীতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল যুগরুচি এবং চাহিদার দ্বারা।১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর বৃটিশ বণিকের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত হল।কলকাতা তখন ধীরে ধীরে পূর্বের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে।ইংরেজের সাহচর্যে কলকাতাকে আশ্রয় করে বেণিয়া,মুৎসুদ্দি এবং শেঠদের একটি নতুন সমাজ গড়ে উঠলো যাদের রুচি,আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দিয়ে শহরকেন্দ্রিক

জাঁকজমকের প্রকাশ ঘটলো।ফলে অন্য পাঁচটি লোকশিল্প-মাধ্যমের মতো যাত্রার মানেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখে গেল।সমাজবন্ধন যখন শিথিল,ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার অনুপস্থিত,শিক্ষাহীন,রুচিহীন নব্য বিত্তশালী সম্প্রদায় তখন খেউড়,কবিগান,হাফ-আখড়াই,বুলবুলির লড়াই - এসবের মধ্যেই জীবনোপভোগের উপাদান খুঁজে চলেছে।যাত্রার কাহিনী এসময় স্থূল ভাঁড়ামি,অশ্লীলতা ও আদিরসের দ্বারা ক্লেদাক্ত হয়ে উঠেছে,কৃষ্ণযাত্রার ভক্তিরস তরল উচ্ছ্বাস এবং খিস্তি-খেউড়ে ভেসে যাচ্ছে।।ফলে নব্য শিক্ষিত সমাজ সে সময় যাত্রাকে ইতর জনসাধারণের লোকরঞ্জনের অনুষ্ঠান বলে চিহ্নিত করে।অন্যদিকে হিন্দু কলেজ স্থাপন,ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের কারণে নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছে,যারা বিদেশী রঙ্গালয়ে উচ্চমানের ইংরেজী নাটকাভিনয় দেখার সুযোগ পেয়েছিল।তাদের বিচারে যাত্রার তুলনায় থিয়েটার হল অনেক উৎকর্ষমণ্ডিত শিল্পের প্রকাশ,যাত্রায় বিকৃত রুচির পরিচয়,তাই তা নিন্দার্হ।শিক্ষিত সমাজের এই মনোভাবের কারণেই বাংলাদেশে নাটকাভিনয় শুরুর দিনগুলিতে তার বহিরঙ্গে যাত্রার কিছুটা প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও তার মূল অবয়বটি ইংরেজী থিয়েটারের রীতি-রেওয়াজকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে।উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে যাত্রার বিষয়ও পরিবর্তিত হতে থাকে।অনাদৃত যাত্রার সংস্কারের মাধ্যমে তাকে যুগোপযোগী করে তোলার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।বৈচিত্রহীন একঘেয়ে গানের বদলে যাত্রায় নাট্যিক ক্রিয়া এবং সংলাপ ব্যবহার শুরু হয়।তবে তখনও ভক্তিরস,আদিরস এবং স্থূল ভাঁড়ামির যুগপৎ সহাবস্থানই ছিল যাত্রার প্রধান আকর্ষণ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন থিয়েটার বা বিলিতি যাত্রাই ছিল কলকাতার ধনী সম্প্রদায়ের সর্বাধিক আদৃত প্রমোদব্যবস্থা।ধনীর প্রাসাদমঞ্চে বাংলা নাটকের অভিনয়ে যাত্রার অনুষঙ্গ ব্যবহারে যদিও আপত্তি ছিলো না।তাই নবীন বসুর নাট্যশালাতেও থিয়েটারি রীতিতে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় চোখে পড়ে।থিয়েটারের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়লেও গ্রামীণ সমাজে আনন্দ এবং শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে যাত্রাভিনয় দীর্ঘস্থায়ী হয়।লোচন অধিকারী,কৃষ্ণকমল গোস্বামী,মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় থেকে

মতিলাল রায় পর্যন্ত যাত্রা অনেকক্ষেত্রে থিয়েটারের প্রতিস্পর্ধী জনপ্রিয়তা নিয়েও দাঁড়াতে পেরেছিল।

যাই হোক,এই পরিচ্ছেদে বাঙালীর যাত্রার ঐতিহ্যটিকে স্মরণ করার কারণ বাংলা নাটকের বিবর্তনের সঙ্গে তার যোগসূত্রটিকে বিচার-বিশ্লেষণ করা।সেদিক থেকে দেখতে গেলে অষ্টাদশ শতকে যে যাত্রার গৌরব অবক্ষয়ের পথে এমনিতেই অনেকাংশে ম্লান হয়ে পড়েছিল,বাংলাদেশে বিদেশী রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং ইংরেজী নাটকের অভিনয়ের প্রচলনে তা প্রায় পুরোপুরি লুপ্ত হল।সেকারণেই বাংলাদেশে নাটকাভিনয়ের যে প্রথা ও প্রকরণ গড়ে উঠেছিল,তার সঙ্গে যাত্রার যোগাযোগ থাকলো অল্প।এমনকি ইংরেজ ব্যতীত রুশদেশীয় লেবেডেফ তাঁর নাট্যশালায় বাঙালী ভাষা এবং দর্শককে গুরুত্ব দিলেও ইংরেজী থিয়েটারের আদর্শেই নিজস্ব নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন।

৪.২ লেবেডেফ এবং তাঁর রঙ্গালয়

রাশিয়ার ইউক্রেন অঞ্চলের অধিবাসী লেবেডেফ কলকাতায় প্রথম বাংলা নাটকের আয়োজক।১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর তাঁর বেঙ্গলী থিয়েটারে 'কাল্পনিক সংবদল' নাটকটির প্রথম অভিনয় সংসাধিত হয়।নাটকটি ইংরেজ নাট্যকার রিচার্ড পল জড্রেলের 'The Disguise' নাটকের অনুবাদ।এই অনুবাদ সম্পূর্ণভাবে বাংলায় নয়,বরং এর অধিকাংশই ছিল বাংলায় অনূদিত।লেবেডেফের উদ্যোগে বেঙ্গলী থিয়েটারে এই একটি নাটকই দুইবার মঞ্চস্থ হয়।তবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে লেবেডেফ এবং তাঁর The Bengally Theatre এর প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত জেনে নেওয়া জরুরী।

হেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেডেফ একজন ভাগ্যান্বেষী পর্যটক হিসেবে ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে এসে মাদ্রাজে বসবাস করতে শুরু করেন।সেখানে তিনি প্রথমে তামিল ভাষা শিক্ষা করেন।এরপর তিনি ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতি-সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ নিয়ে কলকাতায় এসে প্রথমে সংস্কৃত শেখেন।এছাড়া বাংলা ভাষা সম্পর্কেও তিনি আগ্রহী হন এবং গোলকনাথ দাসকে শিক্ষক নিযুক্ত করে তাঁর সাহায্যে বাংলা ভাষা রপ্ত করেন।তিনি হিন্দি ভাষাশিক্ষাও করেছিলেন বলে জানা যায়।কলকাতায় প্রথমে তিনি

যন্ত্রশিল্পী হিসেবে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে এবং নৃত্যগীত অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করতেন।

কলকাতায় তখন পুরোদস্তুর ইংরেজী থিয়েটারের অনুসরণে ইংরেজী নাটকের অভিনয় প্রচলিত হয়েছে।সেখানে রঙ্গমঞ্চ,নাট্যকার,অভিনেতা,দর্শক,প্রযোজক সকলেই বিদেশী।এই ধরণের একটি রঙ্গালয়ের নাট্যপ্রচেষ্টা সে সময় সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। 'দি নিউ প্লে হাউস' বা 'দি ক্যালকাটা থিয়েটার' নামে পরিচিত এই রঙ্গালয়টি Subscription Performance চালুর মধ্যে দিয়ে প্রেক্ষাগৃহে দর্শ নিশ্চিত করতে চাইছে।লেবেডেফ তাঁর The Disguise নাটকটির অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' এখানেই মঞ্চস্থ করতে চেয়েছিলেন।কিন্তু রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে অপমান করে ফিরিয়ে দেয়।তখন লেবেডেফ ক্যালকাটা থিয়েটারের নিকটবর্তী অঞ্চলে,কলকাতার ২৫ নম্বর ডোমটোলায়(বর্তমানে ৩৭-৩৯ নম্বর এজরা স্ট্রীট) জগন্নাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে নিজের উদ্যোগে একটি নাট্যশালা প্রস্তুত করেন এবং তার নামকরণ করেন The Bengally Theatre;এই মঞ্চে আয়োজিত দুটি অভিনয়েই তাঁর অনূদিত নাটকটি বিশেষ দর্শক-আনুকূল্য লাভ করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাঙালীর সাথে বিদেশী রঙ্গালয়ের যোগ ছিল অত্যল্প।শুধু কিছু বাঙালী জমিদার,ধনী শেঠ ও বণিকেরা তখন নিছক কৌতূহল নিবৃত্তির কারণেই ইংরেজের থিয়েটারে উঁকি দিতে শুরু করেছে।বাইরের বৃহত্তর জনমানস তখনও ঢপ-কীর্তন-কবিগান-ঝুমুর-তর্জার আসরেই মজে রয়েছে।যাত্রায় অশ্লীলতা এবং চটুল ভাঁড়ামি হয়েছে লোকরঞ্জনের উপাদান।আসলে ইংরেজের রঙ্গালয়ে ইংরেজী নাট্যরসাস্বাদনের যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ কোনটাই এদের করায়ত্ত ছিলো না।সাধারণ বাঙালী দর্শক নাট্যশালা থেকে দূরে থাকায় এবং কলকাতায় অল্পসংখ্যক বিদেশী বসবাসের কারণে ইংরেজী রঙ্গালয়ে দর্শকের উপস্থিতি ছিল আয়াসসাপেক্ষ।তাই বিদেশী রঙ্গালয় এসময় এক চূড়ান্ত দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হচ্ছিল।লেবেডেফ এই দুরবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।সেই কারণেই তিনি তাঁর রঙ্গালয়ে ইংরেজ ও বাঙালী - উভয় শ্রেণীর দর্শককেই আকৃষ্ট

করতে চেয়েছিলেন।তাঁর নাট্যপ্রচেষ্টাটি পুরোপুরি ইংরেজী নাটকও ছিলো না,আবার যাত্রার থেকেও এর প্রকৃতি ছিল স্বতন্ত্র।সে সময়ে দর্শকের অভিরুচি এবং চাহিদা তিনি বিলক্ষণ বুঝতেন।তিনি জানতেন গম্ভীর উপদেশাত্মক কথার বদলে সকলে নাটকে অনুকরণ,হাসি,তামাশার সমাবেশই পছন্দ করে।তাই বিচিত্র প্রকৃতির টাইপ চরিত্রে তিনি তাঁর নাটকটি ভরিয়ে তুললেন।মলিয়্যের রচিত 'Love is the Best Doctor' এবং রিচার্ড পল জড্রেলের 'The Disguise' নাটকদুটি মূলত কৌতুকরস-উচ্ছল।প্রথমে দুটি নাটক নির্বাচন করলেও শেষ পর্যন্ত বেঙ্গলী থিয়েটারে একটি নাটকেরই দুইবার অভিনয় সম্ভব হয়েছিল।তৃতীয়বার অভিনয়ের জন্য তিনি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেও সে অভিনয়ের পূর্বেই তাঁর রঙ্গমঞ্চটি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়।পুনরায় তার সংস্কার করে লেবেডেফ সেখানে একটি অপেরা মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করেন।কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।তখন ভগ্নোদ্যম লেবেডেফ সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে ইংল্যান্ড এবং সেখান থেকে নিজের দেশ রাশিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন।১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে সেখানেই তিনি লোকান্তরিত হন।

৪.৩ অভিনয়ের বর্ণনা

লেবেডেফ ইংরেজী ও রুশীয় রঙ্গশালার মিশ্রণে নিজের থিয়েটার নির্মাণ করেছিলেন।নিজের নক্সা অনুযায়ী নির্মিত প্রেক্ষাগৃহটি সম্পর্কে তিনি বিজ্ঞাপনে বলেছেন - 'DECORATED In The Bengallee Style'; কারো মতে এই ঘোষণা শুধুমাত্র চমক ছাড়া আর কিছু নয়।তবে অনেকেই 'Bengallee Style' বলতে মঞ্চের বাইরে আল্পনা,মঙ্গল কলস,কলাগাছের ব্যবহার এবং বাংলাদেশের পরিবেশ অনুযায়ী দৃশ্যপট নির্মাণের কথা বলতে চেয়েছেন।যাই হোক,এই অভিনয়ের জন্য লেবেডেফ তাঁর ভাষাশিক্ষক গোলকনাথ দাসের সহায়তায় বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহ করেছিলেন।এইসব অভিনয়কারীরা কেউই ভদ্রসমাজভুক্ত ছিলেন না।এতদিন সাহেবদের থিয়েটারে মেয়েরা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করলেও বাঙালী নারীর এই প্রথম রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ।

'কাল্পনিক সংবদল' নাটকটি মোট তিনটি অঙ্ক এবং সাতটি দৃশ্যে বিন্যস্ত।এই তিনটি অঙ্কের মধ্যে ১ম অঙ্ক বাংলা ভাষায়,২য় অঙ্কের ১ম দৃশ্য মুর ভাষায়,২য় দৃশ্য বাংলা এবং ৩য় দৃশ্য ইংরেজী ভাষায় অভিনীত হয়েছিল।৩য় অঙ্কের পুরোটাই বাংলা রূপান্তরিত হয়েছিল।লেবেডেফ ইংরেজ এবং বাঙালী দুই ধরণের দর্শকের কথা মাথায় রেখেই তাঁর নাটকটি প্রস্তুত করেছিলেন।ইংরেজদের পক্ষে যেহেতু বাংলা ভাষায় অভিনয় বোঝা সম্ভব ছিলোনা সেই কারণেই অভিনয়ের পূর্বে বাংলা অংশের ইংরেজী বিবরণ বিলি করা হয়।ইংরেজী দৃশ্যের অভিনয় বিদেশী অভিনেতাদের দ্বারাই সাধিত হয়েছিল।

লেবেডেফের থিয়েটারের দর্শনীমূল্য ক্যালকাটা থিয়েটারের থেকে কম ছিল।২৭শে নভেম্বর,১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম অভিনয়ে বক্স এবং গ্যালারীর মূল্য ছিল যথাক্রমে আট সিক্কা টাকা ও চার সিক্কা টাকা।প্রায় দুশো আসনবিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহটি সম্পূর্ণ পূর্ণ হয়েছিল বলে জানা যায়।পরের বছর ২১শে মার্চ দ্বিতীয় অভিনয়ে প্রতিটি আসনের মূল্য এক মোহর ধার্য করা হয়েছিল।প্রেক্ষাগৃহের আসন সংখ্যাও দুশো থেকে বাড়িয়ে তিনশো করা হয়।কিন্তু তাতেও প্রেক্ষাগৃহটি দর্শকপূর্ণ হয়ে যায়।এরপরেই লেবেডেফ তৃতীয়বার নাটকাভিনয়ের উদ্যোগ করতে থাকেন।

অভিনয়ের কথা যেটুকু জানা যায় তা অনুযায়ী নাটকের মূল কুশীলব চারজন পুরুষ এবং তিনজন নারী।এছাড়া পুরুষ কান ও মায়্যা কানের উপস্থিতি দেখা গিয়েছে।কান হল কিন্নরের অপভ্রংশ,গান যাদের ব্যবসায়,উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তাদের 'কান' অভিধায় সম্ভাষণ করা হতো।নাটকে 'গাউয়্যা','বাজিয়্যা' হিসেবে নাট্যকার এদের পরিচয় দিয়েছেন।কেবলমাত্র গীত-বাদ্য ছাড়া এদের নাটকে কোন ভূমিকা ছিলোনা।অনুমিত হয় যে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে গানগুলি সংযোজিত হয়েছিল।যাত্রার কায়দায় নান্দীমুখ এবং ঐকতান বাদনের মধ্যে দিয়ে নাটকের সূচনা হয়েছিল।এইজন্য দেশী-বিদেশী যন্ত্র সহযোগে ঐকতান-বাদনগোষ্ঠী গঠিত হয়।তারা দৃশ্য বা পট-পরিবর্তনের মাঝেও সঙ্গীত পরিবেশন

করতেন।পরবর্তীকালে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য যে অর্কেষ্ট্রা দল গঠন করেছিলেন তার পূর্ব লক্ষণ এখানে রয়েছে।

নাটকটির ভাষা সম্পর্কে এটুকুই বলা যায় যে এখানে ব্যবহৃত বাংলা একেবারেই সুগঠিত ছিলো না।বরং তা ছিল স্বভাবধর্মের দিক থেকে অত্যন্ত দুরূহ,শব্দবিন্যাসেও অস্পষ্টতা ছিল।আসলে তখনও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি,রামমোহন বা বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের সংস্কার সাধনে অবতীর্ণ হন নি।ফলে লেবেডেফের অনুবাদে হয়ে রইলো অমার্জিত,অপরিণত ভাষাজ্ঞানের নিদর্শন।

লেবেডেফ তাঁর নাটকটি ইউরোপীয় আদর্শে অঙ্ক-দৃশ্য বিভাজনের দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন।চরিত্র চিত্রণ অপেক্ষা প্লটের বন্ধনের দিকেই তাঁর অধিকতর দৃষ্টি ছিল।নাটকটিকে বাঙালীর আস্বাদনীয় করে পরিবেশনের জন্য লেবেডেফ মূল কাহিনীতে অনেক নতুন বিষয় সংযোজন করলেন।চরিত্র এবং স্থাননামগুলি পরিবর্তিত হল।তখনও সমাজে 'বিদ্যাসুন্দর'-এর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই লেবেডেফ তাঁর নাটকে ভারতচন্দ্রের গান ব্যবহার করেছিলেন।অভিনয়কে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য চরিত্রগুলির সাজসজ্জায় অভিনবত্ব আনার চেষ্টা করা হয়।বিভিন্ন রকমের পোশাক এবং মুখোশের ব্যবহার অভিনয়ের আকরেষণ বৃদ্ধি করেছিল।

লেবেডেফের বেঙ্গলী থিয়েটারের দুটি অভিনয়ের সাফল্যে ক্যালকাটা থিয়েটার কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন।সেসময় কলকাতায় একসাথে দুটি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলোনা।তাই ক্যালকাটা থিয়েটারের টমাস রোওয়ার্থ প্রমুখেরা লেবেডেফের সর্বনাশের পরিকল্পনা করতে থাকেন।তৃতীয় অভিনয় আয়োজনের পূর্বেই কোন অজ্ঞাত কারণে বেঙ্গলী থিয়েটার অাগুণ লেগে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।এর ফলে আর্থিক দিক থেকে লেবেডেফ যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন,তার প্রভাব থেকে বেরিয়ে আরো একবার রঙ্গালয়ে নাটকাভিনয় আয়োজন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

৪.৪ সীমাবদ্ধতা

বাঙালীর নিজস্ব থিয়েটার স্থাপিত হওয়ার অনেক আগেই রুশদেশবাসী লেবেডেফ নাট্যশালা তৈরী করে বাংলা নাটকের অভিনয় করেন।বাংলা নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে এই ঘটনার আলাদা তাৎপর্য রয়েছে।তবে লেবেডেফের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে বাঙালীর নাট্যপ্রচেষ্টা গড়ে উঠতে আরো প্রায় তিন দশক অপেক্ষা করতে হয়েছিল।আসলে ভাষার দুরূহতা ও আড়ষ্টতার কারণে লেবেডেফের নাটকটি সর্বজনবোধ্য হয়ে উঠতে পারেনি।তাছাড়া ক্যালকাটা থিয়েটারের তুলনায় দর্শনী মূল্য কিছুটা কম হলেও তা সাধারণ বাঙালী দর্শকের পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল।তাছাড়া তখনো নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেনি যাঁরা বাঙালীর নাট্যমনন গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।ফলে লেবেডেফের প্রয়াসকে অনুসরণের জন্য সেসময় কেউ উপস্থিত ছিলেন না।তাই বাংলায় থিয়েটার স্থাপন এবং নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে লেবেডেফের প্রয়াসটি নিঃসঙ্গ,একক প্রচেষ্টা হয়েই রইলো।লেবেডেফ কোন নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি।তিনি কেবল এদেশের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং অকৃত্রিম অনুরাগ থেকে একটি রঙ্গালয় স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন,যেখানে ইংরেজদের পাশাপাশি বাঙালী দর্শককেও সাদরে গ্রহণ করা হবে।যাই হোক,লেবেডেফের প্রচেষ্টাটি সর্বতোভাবে প্রশংসনীয় হলেও,তা বাঙালীর জীবনে কোন দীর্ঘস্থায়ী আলোড়ন তৈরী করতে পারেনি।এখানে একটি নাটকই কেবলমাত্র দুইবারের জন্য অভিনীত হয়েছিল।সেই অভিনয় কোনভাবেই ত্রুটিমুক্ত ছিলোনা।তবে লেবেডেফ এই যুগসন্ধির চাহিদাকে যথার্থভাবে অনুভব করতে পারার কারণেই প্রেমের উচ্চ আদর্শের কমেডি বা গম্ভীর ট্র্যাজেডির বদলে হালকা প্রণয়,রঙ্গ এবং স্থূল দেহপ্রেমের নাটকটি নির্বাচন করেছিলেন।এই কারণেই তাঁর প্রযোজনা সেসময়ে দর্শকমহলের সমাদর লাভ করেছিল।ফলে ইংরেজী রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর উদ্যোগকে খুব একটা সুনজরে দেখেনি।অনুমান করা হয় যে বেঙ্গলী থিয়েটার আগুনে পুড়ে যাওয়ার পিছনে তাঁর প্রতি ইংরেজদের বিদ্বেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।রঙ্গালয় স্থাপন এবং নাটকাভিনয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলে লেবেডেফের যে পরিণতি হয়েছিল,তা

ইংরেজ ব্যতীত অন্য জাতির আগ্রহীদের মধ্যে নিরুৎসাহ এবং ভীতির সঞ্চার করেছিল।ফলে পরবর্তীতে লেবেডেফের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।সর্বোপরি অষ্টাদশ শতকের শেষ প্রান্তে তখনও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়নি।সংস্কৃতির অন্যান্য পরিসরগুলির মতো নাটকের অগ্রগতিতেও মধ্যবিত্তের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।লেবেডেফের প্রচেষ্টার প্রায় তিন দশকেরও বেশী সময় পরে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালীর উদ্যোগে ইংরেজী নাটকের অভিনয় হয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারে।তারও কয়েক বছর পরে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে নবীন বসুর বাড়িতে বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ বাংলা নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।ধনী বাঙালীর উৎসাহ এবং অর্থানুকূল্যেই ইংরেজী শিক্ষিত তরুণেরা বাংলা নাটকের বিষয়ে আগ্রহী হয়েছিলেন।তবে তাঁদের নাট্যবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও চৌরঙ্গী বা সাঁ সুসি থিয়েটারের অভিনয় যতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল,লেবেডেফের বেঙ্গলী থিয়েটার তেমন ভূমিকা নিতে পারেনি।

৪.৫ গুরুত্ব

উপরোক্ত আলোচনা সত্ত্বেও বাংলা থিয়েটারের বিবর্তনে লেবেডেফ ও তাঁর The Bengally Theatre সম্পূর্ণভাবে গুরুত্বহীন নয়।পরবর্তীকালে বাঙালীর নাটকাভিনয়ের সঙ্গে এই থিয়েটারের সংযোগসূত্র অনুসন্ধান করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হওয়া যেতে পারে -

১. লেবেডেফের থিয়েটারে ইংরেজ দর্শকের পাশাপাশি বাঙালী দর্শককেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।সাজসজ্জা এবং দৃশ্যপটের নিরিখেও বেঙ্গলী থিয়েটারে বাঙালীর রুচি এবং আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

২. এই থিয়েটারেই সর্বপ্রথম অধিকাংশ বাংলায় লিখিত নাটকের অভিনয় হয়।

৩. অভিনয়ের পুরোভাগে ছিলেন বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রীরা।বিশেষত অভিনেত্রীদের আবির্ভাব পরবর্তীকালে বাংলা থিয়েটার এবং যাত্রাভিনয়ে নারীর আগমনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

৪. লেবেডেফের পূর্বে বাঙালীর যাত্রাভিনয়ে প্রবেশ-প্রস্থান ছিলোনা।অঙ্কবিভাজন থাকলেও দৃশ্যবিভাগ দেখা যায়নি।লেবেডেফই প্রথম তাঁর নাটকে প্রবেশ-প্রস্থান এবং মঞ্চের বিধি-ব্যবস্থাগুলিকে নির্দিষ্ট করেন।এছাড়া তিন অঙ্কের নাটকটিকে সাতটি দৃশ্যে বিন্যস্ত করে তিনি প্লটের সুগ্রন্থনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন।

৫. যাত্রার বাইরেও যে অভিনয়ের আলাদা ক্ষেত্র থাকা সম্ভব সে ব্যাপারে লেবেডেফই প্রথম বাঙালীকে সচেতন করেন।

৬. তিনি নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সামাজিক বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে বাঙালীর অভিনয়কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যে যাত্রাভিনয়গুলির আয়োজন হয়েছিল অনেকক্ষেত্রেই তার মধ্যে পৌরাণিক দেবমাহাত্ম্যের বদলে সামাজিক ঘটনা গৃহীত হতে থাকে।

৭. লেবেডেফ তাঁর নাটকে দেশী-বিদেশী যন্ত্রের সহযোগে সঙ্গীতের প্রয়োগ করেন।অভিনয়কে কেন্দ্র করে তিনি ঐকতান-বাদনের ব্যবস্থা করেছিলেন যা সখের নাট্যশালার নাট্যউদ্যোগকে প্রভাবিত করেছিল।

৮. লেবেডেফ ইংরেজী নাটকের আক্ষরিক না হলেও বিশ্বস্ত অনুবাদ করেছেন।তিনি নাটকের কাহিনীকে বাংলার জনমানসের পক্ষে উপযোগী করে প্রস্তুত করেছেন।

- এই সমস্ত দিক বিচার করে দেখতে গেলে বাংলা নাটক এবং থিয়েটারের আলোচনায় প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা স্থাপনের কারিগর এই রুশদেশীয় নাট্যব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়।

৪.৬ অনুশীলনী

১. যাত্রার উদ্ভবেতিহাসের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত কর।বাংলাদেশে নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে যাত্রার কতখানি প্রভাব রয়েছে তার বিবরণ দাও।

২. লেবেডেফের The Bengally Theatre -এ নাটকাভিনয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বাংলা নাটক এবং থিয়েটারের ইতিহাসে এই রঙ্গালয়টির গুরুত্ব বর্ণনা কর।

মন্তব্য

৩. লেবেডেফ স্থাপিত বেঙ্গলী থিয়েটার পরবর্তীকালে বাঙালীর নাট্যপ্রচেষ্টাকে কতটা প্রভাবিত করতে পেরেছিল?বেঙ্গলী থিয়েটারের অভিনয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪.৭ গ্রন্থঋণ

১. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস - দর্শন চৌধুরী

২. বাংলা নাটকের বিবর্তন - সুরেশচন্দ্র মৈত্র

৩. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস - শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

৪. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর - অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৫. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য়) - আশুতোষ ভট্টাচার্য

৬. ভারতীয় নাট্যমঞ্চ - হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

৭.বাংলা থিয়েটার - কিরণময় রাহা

একক ৫ - সখের নাট্যশালায় নাটকাভিনয়

বিন্যাস ক্রম

৫.১ ভূমিকা

৫.২ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার'

৫.৩ নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালা

৫.৪ ওরিয়েন্টাল থিয়েটার

৫.৫ আশুতোষ দেব বা সাতুবাবুর নাট্যশালা

৫.৬ বেলগাছিয়া নাট্যশালা

৫.৭ পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়

৫.৮ অন্যান্য নাট্যশালা

৫.৯ সখের নাট্যশালার গুরুত্ব

৫.১০ অনুশীলনী

৫.১১ গ্রন্থঋণ

৫.১ ভূমিকা

বাঙালীর দ্বারা বাংলা নাটকাভিনয় প্রত্যক্ষ করবার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয় উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত।মূলত হিন্দু অভিজাত বাঙালী কলকাতার সাহেবি রঙ্গালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নাটকাভিনয়ের মধ্যে একটি নতুন প্রমোদ ব্যবস্থার সন্ধান

খুঁজে পায়।তাছাড়া হিন্দু কলেজ স্থাপন,ইংরেজী শিক্ষার প্রসার,নবজাগৃতির প্রথম আলোর প্রভাবে বাঙালী নব্যশিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে।এই যুবকেরা স্কুল-কলেজে ইংরেজী নাটক পাঠ করে,অভিনয় দেখে এবং তাতে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে বিলিতি থিয়েটার এবং নাটকের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন।উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বাঙালীর মানস বদলের সূচনা হয়।এই বদলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের জন্য উপযুক্ত মানুষদের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল।

বাঙালীর থিয়েটার প্রচেষ্টার মূলে যে ইংরেজী থিয়েটারের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে সে বিষয় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।কলকাতার বিদেশী রঙ্গালয়গুলির পরিচালনায় সে সময়ে অনেক ধনী বাঙালী এগিয়ে এসেছিলেন।তাঁরা সদস্য,পৃষ্ঠপোষক,অর্থদাতা,অভিনেতা বিভিন্নভাবে এই সমস্ত রঙ্গালয়ের সাথে জড়িত ছিলেন।উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে অভিজাত বাঙালী নিজেদের ঠাঁটবাট-জাঁকজমক প্রদর্শনের মাধ্যম হিসেবে থিয়েটারের উপযোগিতাকে অনুভব করতে পারছিলেন।প্রমোদের আর পাঁচটি মাধ্যমের মতোই থিয়েটারে অর্থব্যয় করে নিজেদের উন্নত রস-রুচি প্রকাশের করে সুযোগ তারা হাতছাড়া করতে চাননি।তাছাড়া নাটকাভিনয়ের আয়োজন সেখানে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী এবং সাহেবদের আপ্যায়নের দ্বারা তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার অভিপ্রায়ও কাজ করেছিল।

ধনীদের নাট্যশালায় থিয়েটারের গতি ও নাটকের বিষয় নির্ধারিত হয়েছে পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তিদের প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করে। বলা বাহুল্য,থিয়েটারের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে এরা নাটকাভিনয়ে উদ্যোগী হননি।ধনী বাঙালীর দ্বারা স্থাপিত মঞ্চগুলির কোনোটিই স্থায়ী ছিলনা।ফলে নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে কোন ধারাবাহিকতা রক্ষা সম্ভব হয়নি।মালিকের শখ-সৌখিনতার ওপরেই এই অভিনয় নির্ভরশীল ছিল।জাঁকজমকপূর্ণ থিয়েটারের আয়োজন করে সাহেবদের সঙ্গে একই পঙক্তিতে বসার প্রচেষ্টা এই উদ্যোগে যতটা দেখা যায়, নাট্যকলার উন্নতির জন্য ততখানি আন্তরিকতা দেখা যায়নি।তবে এত কিছুর মধ্যেও অনেকেই বাংলা নাটক এবং অভিনয়ের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ দেখিয়েছিলেন।সবথেকে বড় কথা বাংলা নাটক ও থিয়েটারের সঙ্গে

শিক্ষিত নব্য তরুণ বাঙালীর যোগসূত্র স্থাপন করে দেয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্যোগের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

৫.২ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার

বাঙালির দ্বারা স্থাপিত প্রথম নাট্যশালা হিন্দু থিয়েটার।প্রতিষ্ঠাতা প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর নারকেলডাঙ্গার বাড়িতে থিয়েটারটি প্রস্তুত করেছিলেন।তিনি ছাড়াও থিয়েটার এর পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উল্লেখ করা যায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহ,কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত,গঙ্গানারায়ণ সেন মাধবচন্দ্র মল্লিক,তারাচাঁদ চক্রবর্তী,হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের নাম।এই প্রথম বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পেরিয়ে বাঙালির নাট্যপ্রচেষ্টা বৃহত্তর ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে সার্থকতা খুঁজে পেতে চেয়েছিল।এর পূর্বেই হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়েছে।১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে তার কলেজ স্তরে উন্নীত হওয়া সমাজের মধ্যে এক বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।হিন্দু কলেজ এবং হেয়ার স্কুলের ছাত্ররা অভিনয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ কুশলতা অর্জন করেছিলেন।প্রসন্নকুমার ঠাকুর থিয়েটার স্থাপনের সময় এই সত্যটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন।ফলত,নেটিভ থিয়েটার স্থাপনের উদ্যোগ আর এক কদম এগিয়ে যায়।প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের কাশীপুরের বাগানবাড়িতে একটি সভার আহ্বান করা হয় যার আহ্বায়ক ছিলেন স্বয়ং প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং তাঁর সমমনস্ক আরো কয়েকজন।এই সভায় বাঙালীর দ্বারা পরিচালিত একটি রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।১৮৩১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় এই থিয়েটারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করবেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর।এই বিবরণেই নাটকাভিনয়ে আগ্রহী এই গোষ্ঠীটিকে The Hindu Theatrical Association নামে অভিহিত করা হয়।

যাই হোক,১৮৩১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর 'হিন্দু থিয়েটার'-এ প্রথম অভিনয় সম্পন্ন হয়।একটি নয় বরং দুটি নাটকের অংশবিশেষের অভিনয় হয়েছিল।প্রথমটি ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ।অনুবাদক ছিলেন প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিত এইচ.এইচ উইলসন।দ্বিতীয় অভিনয়ে শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের

পঞ্চম অঙ্কটিকে মূল ইংরেজীতেই সমবেত দর্শকের সামনে পরিবেশন করা হয়।উইলসন সাহেব এখানে শুধু নাটকের অনুবাদকই ছিলেন না,উপরন্তু নাট্যনির্দেশনা দেওয়ার পাশাপাশি তিনি স্বয়ং অভিনয়েও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হিন্দু থিয়েটারের উদ্যোক্তারা ভবভূতির সাথে শেক্সপীয়রের নাটকাভিনয়ের উদ্যোগ করে পাশ্চাত্য আদর্শের সাথে জাতীয় বোধের সমন্বয়সাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন।তবে তাঁদের এই উদ্যোগকে সমাজের রক্ষণশীল অংশ সেসময় কোনভাবেই গ্রহণ করতে পারেনি।হিন্দু থিয়েটারে আরেকটি নাটকাভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়।সেটি ছিল ইংরেজী ভাষায় অভিনীত একটি প্রহসন,নাম - 'নাথিং সুপারফ্লুয়াস'।অভিনয়ের তারিখ ২৯শে মার্চ,১৮৩২।দৃশ্যপট,সাজসজ্জা এবং চরিত্রের বেশভূষার ব্যাপারে নাটকটি দর্শককে চমৎকৃত করেছিল।কোন কোন পুরুষ চরিত্র অভিনয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

তৎকালীন সংবাদপত্রপত্রিকার বিবরণ থেকে জানা যায় হিন্দু থিয়েটার বিদেশী থিয়েটারের অনুসরণেই নির্মিত হয়েছিল।ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে শিক্ষিত বাঙালীর অভিনয়ে বিদেশী আদর্শের প্রভাবের দিকটিকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।বাঙালী ও ইংরেজ উভয় শ্রেণীর দর্শকই এই থিয়েটারে উপস্থিত হয়েছিলেন।সে সময়ের লোকনাট্য বা যাত্রার তুলনায় এখানে অভিনয়ের মান ছিল অনেক উন্নত।প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই থিয়েটার প্রচেষ্টাটি দীর্ঘস্থায়ী না হলেও বাঙালীর নির্মিত প্রথম নাট্যশালা হিসেবে থিয়েটারের ইতিহাসে এর আলাদা তাৎপর্য রয়েছে।

৫.৩ নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালা

ডাকসাইটে ধনী নবীনচন্দ্র বসু তাঁর শ্যামবাজারের বাড়িতে হাজার ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে একটি রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করেন।এই রঙ্গমঞ্চে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকটির অভিনয় হয়েছিল। প্রথম অভিনয়ের কাল সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে। আবার ভূপেন্দ্রনাথ

বন্দোপাধ্যায়,সুবল মিত্র প্রমুখের মতে নাটকটি ১৮৩১ সালে অভিনীত হয়েছিল।মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তাঁর 'রঙ্গভূমির ইতিহাস,১ম ভাগ' গ্রন্থে জানিয়েছেন এই মঞ্চে ১৮৩১ থেকে ১৮৩৭ পর্যন্ত অভিনয়ের ধারা অব্যাহত ছিল।এর থেকে কেউ কেউ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে চার-পাঁচটি নয়,বরং এখানে একটি নাটকেরই একাধিকবার অভিনয় সংঘটিত হয়।

হিন্দু থিয়েটারের অভিনয়ের দ্বারা উৎসাহিত হয়েই নবীন বসু রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করে নাটকাভিনয়ের কথা ভেবেছিলেন।মঞ্চের আদর্শ ইংরেজী থিয়েটারের প্রকৃতি থেকে গৃহীত হলেও এখানে প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় হয়েছিল।সেসময় যাত্রার আসরে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।এরকমই একটি যাত্রাপালা দেখে নবীন বসু নিজস্ব গৃহে অভিনয়ের জন্য বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীকেই নির্বাচন করলেন।কিন্তু তাঁর বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী গৃহীত হলেও উপস্থাপনার প্রকৃতি ছিল নাটকের মতো।এর আগে বাঙালীর নাট্যশালায় ইংরেজী নাটকের অভিনয় হয়েছিল।লেবেডেফ তাঁর মঞ্চে অধিকাংশ বাংলায় লিখিত নাটকের অভিনয় আয়োজন করেছিলেন।কিন্তু বাঙালীর উদ্যোগে গঠিত মঞ্চে বাঙালীর দ্বারা অভিনীত বাংলা নাটকের অবতারণা এই প্রথমবারের জন্য সম্ভব হয়েছিল।

নবীন বসুর নাট্যশালায় বিদ্যাসুন্দর নাটকাকারে প্রথম অভিনীত হয় ১৮৩৫ সালের ৬ই অক্টোবর।রাত্রি ১২টা থেকে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত অভিনয়ের খবর পাওয়া যায়।ইউরোপীয় এবং বাঙালী মিলিয়ে প্রায় এক হাজারের উপর দর্শক নাটক দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন।এখানেই প্রথম নারী চরিত্রে অভিনেত্রীদের গ্রহণ করা হয়েছিল।

অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে নবীন বসু কোন কার্পণ্য করেননি।ফলে যাত্রার গতানুগতিক অভিনয় দেখতে অভ্যস্ত বাঙালীর জন্য এই অভিনয় চমকপ্রদ হয়েছিল।ধনী বাঙালীর দ্বারা আয়োজিত থিয়েটারি জাঁকজমক সেসময়ে অভিনবত্বে সকল শ্রেণীর দর্শককেই বিমোহিত করেছিল।

ড.হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতানুযায়ী এখানে বিদ্যাসুন্দর নাটকটি স্থায়ী নয়,বরং ছড়িয়ে থাকা মঞ্চে অভিনীত হয়।এই বিচিত্র অভিনয়ের কারণে দৃশ্যান্তরের সাথে সাথে দর্শককেও বারবার স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছিল।তবে প্রথমদিকে এই ব্যবস্থা বজায় থাকলেও পরবর্তীকালে স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করে সেখানেই দৃশ্যপটাদি সহ অভিনয়ের উল্লেখ রয়েছে।

এই নাটকের অাকর্ষণের একটি প্রধান দিক ছিল নাটকে আলোর কারসাজি।পাইওনিয়ার পত্রিকার বিবরণ থেকে জানা যায় প্রচুর অর্থব্যয় করে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।বিশেষত আলোর ব্যবহারের দ্বারা মঞ্চে ঝড়বিদ্যুৎ প্রদর্শন দর্শকের প্রশংসার কারণ হয়েছিল।দেশীয় কারিগরদের দ্বারা অঙ্কিত দৃশ্যপট উচ্চমানের হয়ে উঠতে না পারলেও দেশীয় ঐকতান-বাদন যথেষ্ট ভালো হয়েছিল।হিন্দু পাইওনীয়ার পত্রিকার(২২শে অক্টোবর,১৮৩৫) বিবরণে এই বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে।ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত করা যায় -

"সুমধুর ঐকতান বাদনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আরম্ভ হয়।সেতার,সারেঙ্গী,পাখোয়াজ প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্র হিন্দুরাই বাজাইয়াছিল।ইহাদের মধ্যে সকলেই আবার ব্রাহ্মণ।ঐ বাদকদের মধ্যে বাবু ব্রজনাথ গোস্বামী অতিশয় দক্ষতার সহিত বেহালা বাজাইয়াছিলেন এবং চারিদিকের শ্রোতাদের নিকট হইতে ঘন ঘন করতালি লাভ করিয়াছিলেন।"

- নাটকে সুন্দরের ভূমিকায় অবতীরণ হয়েছিলেন শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।স্ত্রীচরিত্র হিসেবে বিদ্যার ভূমিকায় রাধামণি বা মণি নামক ষোল বছরের বালিকা এবং রাণী ও মালিনী উভয় চরিত্রেই জয়দুর্গা নামক এক প্রৌঢ়া রমণী অভিনয় করেন।যাত্রার আদলে এখানেও দর্শক বিনোদনের জন্য কালুয়া-ভুলুয়ার টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছিল।কালুয়া চরিত্রে স্বয়ং নবীন বসু এবং ভুলুয়া চরিত্রে রাজা বৈদ্যনাথ রায় বিশেষ দর্শক সমাদর লাভ করেছিলেন।স্ত্রীচরিত্রের অভিনয়গুলি সেসময়ের সংবাদপত্রে প্রশংসনীয় হলেও কেন কোন গোষ্ঠী স্ত্রীলোকসহএই অভিনয়ে অত্যন্ত নিন্দা এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেন।যাইহোক,রুশদেশীয় লেবেডেফের পর এই প্রথম বাংলা নাট্যালয়ে নারী চরিত্রে অভিনেত্রী গ্রহণ করা হয়েছিল,যা সে যুগের নিরিখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

৫.৪ ওরিয়েন্টাল থিয়েটার

হিন্দু থিয়েটার এবং নবীনচন্দ্র বসুর নাট্য উদ্যোগের পর বেশ কিছুদিন বাঙালীর থিয়েটার চর্চার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়নি।অবশেষে ১৮৫৩ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে একটি যথার্থ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়।এই নাট্যশালাটিই ওরিয়েন্টাল থিয়েটার নামে পরিচিতি লাভ করে।এখানে গৌরমোহন আঢ্যের বাঙালী ছাত্রেরা মূলত ইংরেজী নাটকের অভিনয়েই অভিনিবেশ করেছিল।তবে কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে এখানে একটিমাত্র বাংলা নাটক অভিনীত হয়,তা হল রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'।তবে এর সপক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

এটি সখের নাট্যশালার মধ্যে পরিগনিত হলেও এই এখানে অভিনয়কারী একাধিক ছাত্রেরা পরবর্তী ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অভিনেতা,নির্দেশক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।এঁদের মধ্যে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়,প্রিয়নাথ দে,দীননাথ ঘোষ,প্রিয়নাথ দত্ত প্রমুখেরা উল্লেখযোগ্য।সাঁ সুসি থিয়েটারের মি.ক্লিঙ্গার ছাত্রদের অভিনয় শিক্ষা দিতেন।চৌরঙ্গী থিয়েটারের মি.পার্কারও এই থিয়েটারের সাথে যুক্ত ছিলেন।মি.ক্লিঙ্গারের পরিচালনায় এখানে ২৬শে সেপ্টেম্বর,১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে 'ওথেলো' নাটকটি সার্থকভাবে অভিনীত হয়।পরবর্তী অভিনয় হয় অক্টোবরের ৫ তারিখ।ইয়াগোর ভূমিকায় প্রিয়নাথ দত্ত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।পরে শ্রীমতী ইলিসের নির্দেশনায় শেক্সপীয়রের আরো দুটি নাটক এই মঞ্চে অভিনীত হয়,যথা - 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'(২রা মার্চ,১৮৫৪) এবং 'হেনরি দি ফোর্থ'(১৫ই ফেব্রুয়ারী,১৮৫৫)।দ্বিতীয় নাটকটিতে হেনরি'র ভূমিকায় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শকদের অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসে কেশব গঙ্গোপাধ্যায়,প্রিয়নাথ দত্তেরা প্রমুখেরা ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে রামজয় বসাকের বাড়িতে (কলকাতা চড়কডাঙার টেগোর ক্যাসল রোড) নিজেদের একটি নাট্যসম্প্রদায় গড়ে তোলেন।সেখানে রাধাপ্রসাদ বসাক,রামজয় বসাক,জগদ্দুর্লভ বসাক,রাজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়,মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,বিহারীলাল

চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা মিলে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি অভিনয় করেন।নাটকটি চার রাত্রি অভিনীত হয়।সমস্ত কিছুর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।এটিই ছিল বাঙালীর সমাজ সমস্যামূলক নাটক অভিনয়ের প্রথম উদ্যোগ।এর পরে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বড়বাজারে গদাধর শেঠের নাট্যশালায় প্রায় সাতশো দর্শকের উপস্থিতিতে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি অভিনীত হয়েছিল।চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়ির নাট্যশালাতেও অনুরূপ একটি অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়।

৫.৫ আশুতোষ দেব বা সাতুবাবুর নাট্যশালা

রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি বাংলা থিয়েটারের ক্ষেত্রেও ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।নবীন বসুর বিদ্যাসুন্দর অভিনয় আয়োজনের প্রায় দুই দশক পরে এই বছরেই কলকাতার বুকে একসাথে তিনটি নাট্যশালায় বাংলা নাটক অভিনয়ের সূত্রপাত হয়।এই তিনটি থিয়েটারের প্রতিটির উদ্যোগ অপরের থেকে স্বতন্ত্র ছিল।প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'Bengali Drama and Stage' গ্রন্থে লিখেছেন -

"The Year 1857 marks the beginning of a new epoch in the history of Bengali Drama and the Theatre.In fact, Bengali Drama and the stage have had a continuous histoy since that memorable year."

- নবীন বসুর থিয়েটারে বাংলা নাটকের অভিনয় হয়েছিল ঠিকই,কিন্তু অনেকাংশে তা ছিল যাত্রার প্রকরণের দ্বারা প্রভাবিত।সম্পূর্ণ সংলাপভিত্তিক কোন লিখিত নাটকের অভিনয় সেটি ছিলো না।সেখানে সঙ্গীত,অঙ্গভঙ্গী এবং মূকাভিনয়ের ভূমিকা ছিল মুখ্য।তাছাড়া নাটকে নারীচরিত্রে অভিনেত্রী গ্রহণকে সমাজের একটি বৃহত্তর অংশ কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনি,উল্টে অশালীনতার অভিযোগে অভিনয়ের বিরুদ্ধাচরণের কথা বলেছে।তাছাড়া ইংরেজদের নীতিবাগিশ একটি শ্রেণী খ্রিষ্টিয় ধর্ম এবং নীতিজ্ঞানের সঙ্গে থিয়েটারের সংযোগসূত্রটিকেও মনে করিয়ে দিতে চেয়েছে।ফলে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই অভিনয়ের ব্যাপারে উদাসীন থেকেছে।পরের কুড়ি বছরে কোন ধনী বাঙালী নাট্যশালা নির্মাণ এবং সেখানে বাংলা নাটকের অভ্নয় থেকে বিরত

থেকেছি।এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের সূচনা হয় ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে আশুতোষ দেব,রামজয় বসাক এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের নাট্যশালা তিনটির প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে।এরপর থেকেই বাঙালীর থিয়েটারে বাংলা নাটকের অভিনয় পাকাপাকিভাবে শুরু হয়ে যায়।

১৮৫৭ সাল ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের বছর।অথচ এইসময় বাঙালীর মানসলোকে সেই বিরাট ঘটনার বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।অভিজাত বাঙালী সে সময়ে সমস্ত আলোড়ন থেকে দূরে আমোদ-প্রমোদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেই সন্তোষ লাভ করেছে।কলকাতার লক্ষপতি ধনী আশুতোষ দেব(সাতুবাবু) এবং তাঁর ভাই লাটুবাবু এমনই এক অভিজাত যাঁরা শুধু বিত্তের প্রাচুর্যের জন্যই নয়,বিলাস-ব্যাসনে তার অপব্যয়ের জন্যও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।এই আশুতোষ দেবের বাড়িতেই তাঁর মৃত্যুর পরে জ্ঞানপ্রদায়িনী সভার সদস্যেরা মিলিত হয়ে একটি নাট্যশালা নির্মাণ করেন।প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সাতুবাবুর দুই দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং চারুচন্দ্র ঘোষ।এঁদের অকৃত্রিম উৎসাহ ও প্রচেষ্টার ফলে ১৮৫৭ সালের ৩০শে জানুয়ারি সরস্বতী পুজোর দিন নন্দকুমার রায়ের লেখা 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকটি অভিনয়ের দ্বারা নাট্যশালাটির উদ্বোধন হয়।পূর্বে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত এই নাটকটি ছিল কালিদাসের বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ।

এই নাটকটিতে স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয়ের জন্য কোন অভিনেত্রীকে গ্রহণ করা হয়নি।সকল চরিত্রেই পুরুষেরা অভিনয় করেছিলেন।আসলে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টিকে নাটকের উদ্যোক্তারা অবহেলা করতে পারেননি।নাটকে শরৎচন্দ্র ঘোষ শকুন্তলা, প্রিয়মাধব মল্লিক দুষ্মন্ত, অন্নদা মুখোপাধ্যায় দুর্বাসা, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ অনসূয়া, ভুবনচন্দ্র ঘোষ প্রিয়ম্বদা এবং মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঋষিকুমারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।নাটকের গান রচনার দায়িত্বে ছিলেন কবিচন্দ্র নামে একজন অপরিচিত কবি।

মনোরমভাবে সজ্জিত রঙ্গালয়টিতে প্রায় চারশোটিরও বেশী দর্শক গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল।শকুন্তলা চরিত্রে শরৎচন্দ্র ঘোষের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।নাটকে

আশ্রমনিবাসিনী শকুন্তলার রানীবেশ পরিদর্শনের জন্য সাতুবাবুর বাড়ির মূল্যবান জড়োয়া গয়নার ব্যবহার করা হয়েছিল।ধনীর সম্পদের জৌলুস প্রদর্শনের এই অভিপ্রায় সফল হয়েছিল,শকুন্তলার রানীবেশের বর্ণনা লোকের মুখে মুখে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল।ইংরেজী 'হিন্দু ইনটেলিজেন্স' পত্রিকাতে অভিনয়ের এই অংশটির সমালোচনা করা হয়।এই মঞ্চে অভিজ্ঞান শকুন্তলার দ্বিতীয় অভিনয় হয়েছিল ২২শে ফেব্রুয়ারী,১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে।সেদিন কেবলমাত্র নাটকটির তিনটি অঙ্কের অভিনয় সম্ভব হয়েছিল।

সাতুবাবুর নাট্যশালায় আরো একটি নাটকের অভিনয় সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গিয়েছে।১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর বাণভট্টের সংসকৃত কাদম্বরীর অনুবাদ 'মহাশ্বেতা' নাটকটি অভিনীত হয়।অনুবাদ করেছিলেন মণিমোহন সরকার।সকল চরিত্রেই পুরুষেরা অভিনয় করেছিলেন।সংলাপ রচনা এবং নাটকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই নাট্যপ্রয়াসটিকে স্মরণ করতেই হয়।

দীর্ঘদিন বাদে বাঙালীর নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয় সকল শ্রেণীর দর্শকের নাট্যরসাস্বাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিল।দুটি রচনাই সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হলেও তা একটি ধারাবাহিক নাট্যপ্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবেই গৃহীত হওয়া উচিত।এই নাট্যশালার সাথে যুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং চারুচন্দ্র ঘেষ বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে দুইজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ।তাঁদের উদ্যোগেই কলকাতার বিডন স্ট্রীটে বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়,যা ছিল বাংলার প্রথম স্থায়ীভাবে প্রস্তুত সাধারণ রঙ্গালয়।

৫.৬ বেলগাছিয়া নাট্যশালা

পাইকপাড়ার বিখ্যাত রাজভ্রাতৃদ্বয় প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ইশ্বরচন্দ্র সিংহ ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে এই নাট্যশালাটির নির্মাণ করেন।এক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা পালন করেন সে সময়ের ধনী বিদ্বজ্জন এবং নাট্যোৎসাহী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।তাঁর অনুরোধের কারণে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়,প্রিয়নাথ দত্ত,দীননাথ ঘোষ প্রমুখ ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের গুণী নাট্যজনেরা বেলগাছিয়া

নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।এর পূর্বে ধনী বাঙালীর রঙ্গালয়ে বাংলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হলেও তাকে কেন্দ্র করে শক্তিমান প্লে-রাইটের আবির্ভাব হয়নি।এই নাট্যশালাতেই সর্বপ্রথম শুধুমাত্র অভিনয়ের প্রয়োজনে নাটক রচনার সূত্রপাত হয়।

প্রচুর অর্থব্যয়ের দ্বারা নির্মিত এই নাট্যশালাটির দৃশ্যপট-ভাবনা, মঞ্চসজ্জা, সঙ্গীত, আলোকের ব্যবহার, স্টেজ নির্মাণ সমস্ত কিছুতেই ইংরেজী থিয়েটারের অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়।তবে নাট্যবিষয় এবং ঐকতান-বাদনের ক্ষেত্রে দেশীয় রীতি অনুসৃত হয়েছিল।স্থায়ীভাবে নির্মিত এই রঙ্গালয়ে অভিনীত প্রথম নাটকটি ছিল শ্রীহর্ষের সংস্কৃত 'রত্নাবলী'র বাংলা অনুবাদ।অনুবাদকর্মটি সম্পাদিত হয়েছিল রামনারায়ণ তর্করত্নের দ্বারা যার জন্য তাঁকে দুইশত টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। 'রত্নাবলী'র অভিনয় দিয়েই বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্বোধন হয় ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই,শনিবার।

অভিনয়ের সমস্ত ক্ষেত্রেই পুরুষেরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।অভিনেতাদের পরিচয় থেকেই স্পষ্ট যে তাঁরা সকলেই শিক্ষিত এবং নাট্যরসবোদ্ধা ছিলেন।নাটকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুরুষ চরিত্র যেমন রাজা উদয়নের ভূমিকায় প্রিয়নাথ দত্ত,বিদূষকের ভূমিকায় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়,রুমজ্বান চরিত্রে ইশ্বরচন্দ্র সিংহ,যৌগন্ধ্ররায়ণের ভূমিকায় প্রথমে গৌরদাস বসাক,পরে দীননাথ ঘোষ,রত্নাবলীর ভূমিকায় হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখের কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।বিশেষত বিদূষকের চরিত্রে অভিনয় করে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেন।এই অভিনয়ের জন্য অনেকে তাঁকে 'বাংলার গ্যারিক' অভিধায় ভূষিত করেন।মঞ্চকৌশল,সাজসজ্জা,আলোর ব্যবহার,সঙ্গীত এবং অভিনয়ের গুণে 'রত্নাবলী' নাটকটি বিপুল জনসমাদর লাভ করে।ছোটলাট হেলিডে সাহেব স্বয়ং এই অভিনয় প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছিলেন।হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা এই অভিনয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে সাঁ সুসি এবং চৌরঙ্গী থিয়েটারের প্রসঙ্গ স্মরণ করে।সম্পূর্ণ নাটকটির অভিনয় শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

ইংরেজ দর্শকদের জন্য 'রত্নাবলী'র ইংরেজী অনুবাদের সুবাদে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই নাট্যশালাটির সাথে জড়িয়ে যান।এইরকম একটি নাটকের অভিনয়ে রাজাদের বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় তাঁকে বিস্মিত করে।ফলে 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে' নিমজ্জিত বাঙালীকে যথার্থ নাট্যরসাস্বাদনের সুযোগ এনে দিতে তিনি নিজে বাংলা মৌলিক নাটক রচনায় অগ্রসর হন।তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত দ্বিতীয় নাটক যার প্রথম অভিনয় হয় ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর।সেই বছরে মাত্র একমাসের মধ্যেই নাটকটি ছয়বার অভিনীত হয়।এর থেকেই নাটকটির জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়।

দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে যযাতির ভূমিকায় প্রিয়নাথ দত্ত,বিদূষক মাধব্যের ভূমিকায় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়,শুক্রাচার্য,বকাসুর এবং দেবযানীর ভূমিকায় যথাক্রমে দীননাথ ঘোষ,ইশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অভিনয় করেন।শর্মিষ্ঠার ভূমিকায় কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায়ের অসামান্য অভিনয় সকলের প্রশংসা লাভ করে।নাটকের অভিনয় দেখে স্বয়ং নাট্যকার ভীষণভাবে আপ্লুত হন।এর অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বেলগাছিয়া নাট্যশালার খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।এমনকি অনেকেই এই বিষয়ে একমত সখের নাট্যশালাগুলির মধ্যে যথার্থ নাট্যসংস্কৃতি গড়ে তোলা ও সবথেকে ভালো অভিনয়ের নজির স্থাপন করেছিল এই রঙ্গালয়টি।

'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয় আয়োজনেও সিংহ ভ্রাতৃদ্বয় চেষ্টার কোন খামতি রাখেননি।তবে নাটক রচনায় প্লে-রাইট মধুসূদনকে কতগুলি বিষয় স্মরণে রাখতে হয়েছে 'রত্নাবলী'র নাটকের জন্য যে দৃশ্যপটগুলি অঙ্কিত হয়েছিল এবং সাজসজ্জা ও মঞ্চোপকরণ হিসেবে যা কিছু ব্যবহৃত হয়েছিল সেগুলিকে যাতে এই নাটকেও ব্যবহার করা যায়,সে বিষয়ে নাট্যকারকে সচেতন থাকতে হয়েছে।তাছাড়া 'রত্নাবলী'র অভিনয়ে বিদূষক চরিত্রে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অসামান্য খ্যাতির কারণেই এই নাটকেও তিনি বিদূষক মাধব্য চরিত্রটি সৃষ্টি করতে বাধ্য হন।নাটক রচনায় তিনি প্রয়েজন অনুযায়ী সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় নাট্যাদর্শেরই ব্যবহার করেছেন।

'শর্মিষ্ঠা'র সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মধুসূদন ধারাবাহিকভাবে 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী','একেই কি বলে সভ্যতা?', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটক-প্রহসনগুলির

রচনা করেন।কিন্তু রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষের আপত্তির কারণে এর একটির অভিনয়ও বাস্তবায়িত হয়নি।তাই নাটক রচনার মাধ্যমেই বাঙালীর রঙ্গালয়ে এই শক্তিশালী প্রতিভার আবির্ভাব ঘটলেও,নাট্যকার হিসেবে মধুসূদনের বিকাশের সমস্ত সম্ভাবনাও অকালে রুদ্ধ হয়ে যায় রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতার কারণেই। 'রত্নাবলী' এবং 'শর্মিষ্ঠা' ছাড়া বেলগাছিয়ার নাট্যমঞ্চে আর কোন নাটকের অভিনয় সম্ভব হয়নি।তবু নাটক রচনা,উপস্থাপনা,অভিনয়গুণ এবং মঞ্চকৌশলের মাধ্যমে এই নাট্যশালা উৎসাহী দর্শকজনতার মনে প্রকৃত অর্থে নাট্যরসের সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল যা সেই সময়ের প্রেক্ষিতে কোনভাবেই বিস্মরণযোগ্য নয়।

৫.৭ পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়

সখের নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে নাট্যোৎসাহী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অবদানের কথা পূর্বেই কিছুটা বলা হয়েছে।এবারে ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়িতে তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ইশ্বরচন্দ্র সিংহের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আর কোন নাটকের অভিনয় সম্ভব হয়নি।এর কয়েক বছর পর ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ের প্রথম অভিনয় সম্পন্ন হয়।ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিজে।একইসাথে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' নাটকটিও অভিনীত হয়।এই রঙ্গালয়টির জন্য রামনারায়ণ তর্করত্ন একাধিক প্রহসন রচনা করেছিলেন।সখের নাট্যশালাগুলির সঙ্গে তাঁর আন্তরিক যোগাযোগের ফলে বাংলা থিয়েটারে ধারাবাহিকভাবে বাংলা নাটকের অভিনয় সম্ভব হয়েছিল।

১৮৬৫ সালে প্রথম অভিনয় হলেও ১৮৫৯ সাল থেকেই পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।সেই বছরেই নিজেদের আদিবাড়িতে ছোট ভাই শৌরীন্দ্রমোহনের সহায়তায় যতীন্দ্রমোহন কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের

বাংলায় অনূদিত রূপটির অভিনয়ের বন্দোবস্ত করেছিলেন।তবে পরবর্তীকালে নাট্যালয়টির সংস্কার করা হয় এবং দর্শকাসনও অনেক বর্ধিত হয়।

এখানে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বুঝলে কিনা' নাটকটির অভিনয় দর্শকদের পরিতৃপ্তি এনে দিয়েছিল।এই প্রহসনের অভিনয় তৎকালীন কলকাতার দলপতিদের ভন্ডামী এবং চক্রান্তের মুখোশকে ছিঁড়ে ফেলে তাদের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ এবং আক্রমণের সুরটুকু রেখে যায়।এছাড়া রামনারায়ণের আরো দুটি প্রহসন 'চক্ষুদান' এবং 'উভয়সঙ্কট' অভিনীত হয় ১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকটির সাথেই।এর পূর্বেই ভবভূতির সংস্কৃত নাটক 'মালতীমাধব'-এর রামনারায়ণকৃত অনুবাদের অভিনয় বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে।এরপরে রঙ্গালয়টিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হয়নি।একাধিকবার নাটকের অভিনয় বন্ধ হয়ে যেতে থাকে।১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বড়লাট নর্থব্রুকের সম্মুখে 'রুক্মিণীহরণ' এবং 'উভয়সঙ্কট' নাটকদুটির পুনরাভিনয়ের পর দীর্ঘকাল এই মঞ্চে কোন নাটক পরিবেশিত হয়নি।শুধুমাত্র ১৮৮১ সালে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'রসাবিষ্কারকবৃন্দ' নামক একটি ছোট দৃশ্যকাব্য অভিনয়ের পর এই রঙ্গালয়টি বন্ধ হয়ে যায়।

স্টেজ নির্মাণ,দৃশ্যপট অঙ্কন,অভিনয় সবদিক থেকেই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাট্যশালাটি সুনাম অর্জন করেছিল।এই থিয়েটারটি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছিল।ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণেই হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা এই রঙ্গালয়টিকে জাতীয় নাট্যশালার মর্যাদা দিতে চেয়েছিল।দেশীয় ঐকতান-বাদন,সঙ্গীতের প্রয়োগ বিশেষত শৌরীন্দ্রমোহনের কনসার্ট সেই সময় অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করে।জানা যায় এই রঙ্গালয়ের অভিনয় এবং মঞ্চব্যবস্থা দেখে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।এই বিখ্যাত নট ছিলেন পরবর্তীকালে ন্যাশনাল থিয়েটার এবং সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম কাণ্ডারী।

৫.৮ অন্যান্য নাট্যশালা

শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি তার সংক্ষিপ্ত সময়পর্বটির মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকদুটি অভিনয়ের সাহস ও কৃতিত্ব দেখিয়েছিল।প্রথম অভিনীত প্রহসনটিতে মোট উনিশ জন অভিনেতা অংশগ্রহণ করেছিলেন।নাটক দেখতে দিগম্বর মিত্র,কালীপ্রসন্ন সিংহ,যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ প্রায় একশো জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন।

১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দেই জ্যোতিরিন্দ্ররনাথ ঠাকুর,সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাড়িতে জোড়াসাঁকো নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন।এখানে নাটক নির্বাচন এবং তার প্রযোজনার জন্য একটি পাঁচজনের কমিটি গঠিত হয়,জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং গুণেন্দ্রনাথ ব্যতীত এই কমিটিতে ছিলেন কৃষ্ণবিহারী সেন,অক্ষয় চৌধুরী ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।

কলকাতায় সখের নাট্যশালায় বাংলা নাটক অভিনয়ের সুবর্ণ মুহূর্তে স্থাপিত জোড়াসাঁকো থিয়েটারে নাট্য উদ্যোগ বাকিদের থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র ছিল।এখানে নাটকাভিনয়ের মধ্যে সমাজ সংস্কারের সাথে উচ্চ শিল্পাদর্শের সম্মিলন লক্ষ্য করা যায়।পরবর্তীতে এই রঙ্গালয়ের অভিনয়ে জাতীয় ভাবের লক্ষণসমূহ প্রত্যক্ষ করে নবগোপাল মিত্র উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেছিলেন -

"It had no borrowed airs, and was quite in keeping with national taste."(The National Paper, 9th January, 1867)

- সমাজ সংস্কারমূলক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ইন্ডিয়ন মিরর পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে।এই বিজ্ঞাপনে রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষ বহুবিবাহ,হিন্দুমহিলার দুরবস্থা এবং পল্লীগ্রামস্থ জমিদারের অত্যাচারকে কেন্দ্র করে নাটক রচনার আহ্বান জানান।এই আহ্বানের প্রতিক্রিয়ায় রামনারায়ণ 'নবনাটক' রচনা করেন।১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী নাটকটির প্রথম অভিনয় সম্পন্ন হয়।রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষ নাট্যকারকে রৌপ্যপাত্রে দুশো টাকার দ্বারা পুরস্কৃত করেন।ঠাকুরবাড়ির স্বজনেরা

অনেকেই এই অভিনয়ে যোগদান করেছিলেন।এই নাটকের অভিনয় অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের হয়েছিল বলে জানা যায়।নটীর ভূমিকায় সবথেকে বেশী নজর কেড়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।জোড়াসাঁকো থিয়েটারে 'নবনাটক' মোট নয়বার অভিনীত হয়।এই অভিনয়ের প্রতিক্রিয়ায় সেই সময়ের একটি সাময়িক পত্রিকা মন্তব্য করে -

"এখানে অভিনয় দর্শনের যে রীতি প্রত্যক্ষ করিলাম,তাহা যদি সর্বত্র প্রচারিত হয় তাহা হইলে আমাদের বিশুদ্ধ আমোদ ভোগের একটি উৎকৃষ্ট উপায় হইয়া ওঠে।....নাট্যশালাটি প্রকৃত রীতিতে নির্মিত ও দ্রষ্টব্যার্থগুলি সুন্দর।....সাকুল্য বিবেচনা করিলে গ্রন্থ ও অভিনয় উভয়ই উত্তম হয়েছে।"

(সোমপ্রকাশ পত্রিকা, ১৮৬৭, ২৮শে ফেব্রুয়ারী)

- এছাড়া একই বিজ্ঞাপনের প্রতিক্রিয়ায় বিপিনবিহারী সেনগুপ্ত 'হিন্দুমহিলা নাটক' রচনা করেছিলেন।যদিও সেই নাটকাভিনয়ের কোন অবকাশ পাওয়া যায়নি।

জাঁকজমক,বিত্তসম্পদের আড়ম্বর প্রদর্শন কিংবা নিছক আমোদ-প্রমোদের আয়োজনের বদলে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা অভিনয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছিল।এই প্রয়াসে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে ইংরেজী নাটকের আদর্শকে অনুসরণ করেনি,তার বদলে দেশীয় এবং পাশ্চাত্যরীতির সংমিশ্রণের মধ্যে দিয়ে একটি নবতর নাট্যরীতি নির্মাণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।এক্ষেত্রে তাঁরা যাত্রাভিনয়কেও যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছিল।

পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গশালার দুই অভিনেতা বলদেব ধর ও চুনিলাল বসুর উদ্যোগে বহুবাজার অঞ্চলে অস্থায়ী প্রকৃতির একটি মঞ্চ নির্মিত হয়।এই মঞ্চে প্রথম অভিনীত নাটকটি রচনা করেন রঙ্গালয়ের প্রধান উপদেষ্টা নাট্যকার মনোমোহন বসু ।১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর তাঁর 'রামাভিষেক' নাটকটি দিয়েই এই রঙ্গালয়ের উদ্বোধন।পরবর্তীতে বহুবাজার নাট্যগোষ্ঠীর নিজস্ব স্থায়ী নাট্যশালা নির্মিত হয়।তখন থেকেই এটি বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় নামে পরিচিতি লাভ করে।স্থায়ী মঞ্চে মনোমোহন বসুর 'সতী' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়েছিল।তাছাড়া এখানেই মনোমোহনের

'হরিশ্চন্দ্র' নাটকটি মঞ্চায়িত হয়।বিত্তের প্রাচুর্য না থাকলেও এই রঙ্গালয়ের সদস্যদের আন্তরিকতা ও উৎসাহের অভাব ছিলো না।পেশাদারি থিয়েটার না হলেও কর্মের অনেকক্ষেত্রেই এঁরা পেশাদারিত্বের পরিচয় রেখেছেন।মনোমোহন বসুর মতো শক্তিমান উপদেষ্টা-নাট্যকারের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই নাট্যশালাটি সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে নির্মিত হয়েছিল।মনোমোহন বসু সেসময়ের যাত্রার আঙ্গিকের সংস্কার সাধন করে তার সাথে বিদেশী নাট্যরীতির যথোপযুক্ত মিশ্রণ ঘটিয়ে নাটক রচনায় করেছিলেন যা সেসময়ের সাধারণ দর্শককে অনেকাংশে আকৃষ্ট করেছিল।

৫.৯ সখের নাট্যশালার গুরুত্ব

উনিশ শতকে বাঙালীর যাবতীয় নাট্যপ্রয়াস বিকশিত হয়েছিল সখের থিয়েটারগুলিকে আশ্রয় করেই।এক্ষেত্রে বিত্তবান বাঙালী স্বেচ্ছায় প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যয় করেছিল তা বলা বাহুল্য।কিন্তু তাঁদের এই আয়োজনকে কেন্দ্র করেই নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণেরা বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ে।সখের নাট্যশালার হাত ধরেই রঙ্গালয়ে ধারাবাহিকভাবে বাংলা নাটকের অভিনয় শুরু হয়ে যায়।মঞ্চাভিনয়কে কেন্দ্র করে একাধিক সার্থক প্লে-রাইট আবির্ভূত হন।এঁদের মধ্যে সে সময় সর্বাধিক আদৃত হয়েছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন।তাঁর নাটকের মধ্যে তৎকালীন সমাজভাবনার মূল সুরটি স্পন্দিত হয়েছিল।হিন্দু জাতীয়তার আদর্শ,সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন,সংস্কৃতমুখীনতা - এই সমস্ত কিছুর প্রভাবকে শিরোধার্য করে তিনি নাট্যরচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।মধুসূদনের নাট্যকার জীবনের সূচনা এই সখের নাট্যশালাকে কেন্দ্র করেই।কিন্তু যে সম্ভাবনা নিয়ে তিনি বাংলা মৌলিক নাটক-প্রহসনের রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন,সেই সম্ভাবনা বিনষ্ট হয় এই ধরণের রঙ্গালয়ের সীমাবদ্ধতার কারণেই।মধুসূদনের মতো প্লে-রাইট,যিনি তাঁর যুগের থেকে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন,তাঁর তীব্র সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপধর্মী প্রহসনগুলির অভিনয় আয়োজনে যথেষ্ট সাহসিকতা এবং সদিচ্ছার প্রয়োজন ছিল।সমাজের রক্ষণশীল হোক বা ভণ্ড নব্য বাবু সম্প্রদায় হোক,সকলের ওপরেই তাঁর ব্যঙ্গের তির্যক চাবুক বর্ষিত হয়েছিল।ফলে সমাজপতিরা এই ধরণের নাটকাভিনয়ে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন।দীনবন্ধুর

'নীলদর্পণ' নাটকটির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।অবশ্য এই নাটকটিতে প্রশ্ন উদ্যত হয় বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধেই।তাই ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হলেও,এর অভিনয়ের জন্য আরো এক দশকেরও বেশী সময় অপেক্ষা করতে হয়।আসলে সখের থিয়েটারকে কেন্দ্র করেই রামনারায়ণ তর্করত্ন,মধুসূদন দত্ত,উমেশচন্দ্র মিত্র,মনোমোহন বসু,দীনবন্ধু মিত্রের মতো গুণী নাট্যকারেদের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল।এর ফলে বাংলা নাটক একটি বিশিষ্ট রীতিকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করতে থাকে যেখানে দেশীয় এবং পাশ্চাত্য নাট্যরীতির প্রয়োজনীয় সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।সখের নাট্যশালাগুলির অনুপস্থিতিতে যার প্রতিফলন সম্ভব ছিলো না।

সখের থিয়েটারে অভিনয়,মঞ্চনির্মাণ,দৃশ্যপট অঙ্কন,সাজপোশাক,আলোর ব্যবহার,কনসার্টের ব্যবহারসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইংরেজী থিয়েটারের আদর্শ সর্বতোভাবে স্বীকৃত হয়েছিল।আসলে এখানে অভিনয়কারী,নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশজনই ছিলেন সুশিক্ষিত।ইংরেজী ভাষায় তাঁদের ব্যুৎপত্তি ছিল।স্কুল-কলেজে ইংরেজী নাটকের অভিনয় দেখে এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেই তাঁরা নাট্যরসের সমঝধার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।এঁদের অভিনয় শিক্ষা চৌরঙ্গী,সাঁ সুসি থিয়েটারের খ্যাতিমান ইংরেজ অভিনেতা-নির্দেশকের কাছে সম্পন্ন হয়েছিল।কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ দত্ত,দীননাথ ঘোষ,রাধাপ্রসাদ বসাক,প্রিয়মাধব মল্লিক,শরৎচন্দ্র ঘোষ,চারুচন্দ্র ঘোষ প্রমুখেরা পরবর্তী বাংলা থিয়েটারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি,ধর্মদাস সুরের মতো মানুষ প্রথম জীবনে সখের নাট্যশালার অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের ঋদ্ধ করেছিলেন।আগামী দিনগুলিতে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এঁদের অবদানের কথা সম্পর্কে সকলেই বিদিত।সুতরাং বাংলা নাটকাভিনয় ভবিষ্যতে কোন পথে এগোবে তা অনেকাংশেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল ধনী বাঙালীর নাট্যায়োজনের দ্বারা।আধুনিক বাংলা নাটক যে সংস্কৃত প্রাচীন আঙ্গিকের বদলে মঞ্চনির্দেশ থেকে নাট্যরচনা সকল পরিসরেই পাশ্চাত্য আধুনিক নাট্যরীতিকে অনুসরণ করেই বিবর্তিত হবে সেই সত্যটিও এই সময়েই স্পষ্ট হয়ে আসে।ফলত বাংলা নাটকে সংলাপ

রচনা,প্লটের গ্রন্থন,নাট্যদ্বন্দ্বের প্রয়োগ,ঐক্যবদ্ধ ঘটনা ও জটিল চরিত্র নির্মাণসহ সকল ক্ষেত্রেই আমরা সেই সত্যের ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করি।

সর্বোপরি স্বীকার করতেই হয় যে সখের নাট্যশালা বৃহত্তর বাঙালী সমাজের মধ্যে নাট্যরসাস্বাদনের স্পৃহাকে সঞ্চারিত করেছিল,তাদের টেনে এনেছিল বাঙালীর নিজস্ব রঙ্গালয়ের আঙিনায়,বাংলা নাটকের অভিনয়ে।কবিগান,যাত্রা,আখড়াই ও হাফ আখড়াই গান,খেউড়ের চর্বিতচর্বণ থেকে বেরিয়ে এসে নাটক সম্পর্কে যথার্থ বোধ ও নাট্যসংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সখের নাট্যশালাগুলির ভূমিকা এই সমস্ত কারণেই অবিস্মরণীয়।

৫.১০ অনুশীলনী

১. বাংলা নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে সখের নাট্যশালাগুলি ঠিক কোন ভূমিকা পালন করেছিল?

২. উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে ধনী বাঙালীর উদ্যোগে সখের নাট্যশালা নির্মাণের ইতিবৃত্তটি বর্ণনা কর।

৩. পরিচিত পাঁচটি সখের নাট্যশালা এবং তার নাট্যপ্রচেষ্টার বিবরণ দাও।

৪. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কীভাবে সখের নাট্যশালার সাথে জড়িত হয়ে পড়েন?তাঁর নাট্যকার জীবনের সূচনা,বিকাশ এবং তার অপমৃত্যুর ক্ষেত্রে বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের কতটা প্রভাব ছিল?

৫. বাংলা নাট্যালয়ে মঞ্চাভিনয়ের জন্য নাট্যরচনার সূত্রপাত কীভাবে হয়েছিল?জোড়াসাঁকো থিয়েটারের নাট্যপ্রচেষ্টা সখের নাট্যশালাগুলির মধ্যে কীভাবে স্বতন্ত্র স্থান লাভ করেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬. বাংলা থিয়েটারের বিবর্তনে সখের নাট্যশালার গুরুত্ব/তাৎপর্যগুলি নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

৫.১১ গ্রন্থঋণ

১. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস - দর্শন চৌধুরী

২. বাংলা নাটকের বিবর্তন - সুরেশচন্দ্র মৈত্র

৩. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস - শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

৪. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর - অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৫. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস(১ম ও ২য়) - আশুতোষ ভট্টাচার্য

৬. ভারতীয় নাট্যমঞ্চ - হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

৭. বাংলা থিয়েটার - কিরণময় রাহা

একক ৬ - সাধারন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

বিন্যাস ক্রম

৬.১ ভূমিকা

৬.২ বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার

৬.৩ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

৬.৪ অভিনয়ের বর্ণনা

৬.৫ সংঘাত এবং ফলশ্রুতি

৬.৬ মূল্যায়ন

৬.৭ বেঙ্গল থিয়েটার

৬.৮ অনুশীলনী

৬.৯ গ্রন্থঋণ

৬.১ ভূমিকা

উনবিংশ শতকের মধ্যবর্তী সময়েই ধনীর প্রাসাদ-মঞ্চে বাংলা নাটকের ধারাবাহিক অভিনয়ের সূত্রপাত হয়।এই ঘটনা তৎকালীন বাঙালীর মনে নাটকাভিনয়ের নব্য-ক্ষেত্রটি সম্পর্কে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে।হিন্দু থিয়েটার,নবীন বসুর নাট্যশালা হয়ে সাতুবাবুর থিয়েটার,বেলগাছিয়া নাট্যশালা,পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়,জোড়াসাঁকো থিয়েটারের প্রযোজনাগুলি একদিকে যেমন সাধারণ বাঙালীর থিয়েটার সম্পর্কে কৌতূহলের নিরসন ঘটিয়েছিল,ঠিক তেমনভাবেই বাড়িয়ে তুলেছিল তার

নাট্যস্পৃহাকে।তারা সর্বতোভাবেই ভালো অভিনয়ের দিকে আকর্ষিত হতে থাকে।এইসময় একাধিক শক্তিশালী প্লে-রাইটের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা নাটক রচনার ক্ষেত্রে স্রেফ মঞ্চের প্রয়োজনকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁদের নাটকে সমাজ জিজ্ঞাসা,তার বিচার-বিশ্লেষণ এবং সংস্কারের প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।সমসময়ের প্রহসনগুলি যাবতীয় বিকৃতি,অন্যায়-অবিচার,কুপ্রথার নির্মম সমালোচনা করতে থাকে।বিত্তবানের সৌখিন নাট্যচর্চার পরিসরে সেই সব নাটক-প্রহসনের অভিনয় ছিল অপাংক্তেয়। ফলে মধুসূদন দত্ত,দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলি অনভিনীত অবস্থায় পড়ে থাকে। অথচ নাটকাভিনয়কে কেন্দ্র করে নবজাগ্রত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রত্যাশা কেবলই বৃদ্ধি পায়।শখের নাট্যশালা বাঙালিকে কবিগান,আখড়াই গান,খেউড়ের আসর থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নত রুচি ও বিষয় অবলম্বনে রচিত নাটকের মঞ্চাভিনয়ে টেনে এনেছিল।তারই ধারাবাহিকতায় নবজাগৃতির আলোকপ্রাপ্ত বাঙালি আরো উন্নত নাট্যাদর্শের সন্ধানে উন্মুখ হয়েছিল। এই ব্যাকুলতা অচিরেই তাঁদের মধ্যে শখের নাট্যশালার বাইরেও স্বাধীন নাট্য-উদ্যোগ গড়ে তোলার স্বপ্নকে সঞ্চারিত করেছিল।উনিশ শতকের পাঁচের দশক থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই ধরনের চাহিদার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের প্রতিক্রিয়ায় একটি সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। এই পত্রিকার সিলেকশন বিভাগে 'ক্যালকাটা পাবলিক থিয়েটার'-এর প্রসপেক্টাস ছাপা হয় যেখানে প্রজেক্টর হিসেবে রাধামাধব হালদার যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম ছিল।এই বিজ্ঞাপনটি থিয়েটারে সাধারণ বাঙালী দর্শকের প্রবেশাধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য ইউরোপীয় আদর্শে হিন্দু মঞ্চের সংস্কার-সাধন এবং পুনর্গঠনের কথা বলে।যদিও এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি।

১৮৬৭ সালের আগস্ট মাসের 'নবপ্রবন্ধ- পত্রিকায় সৌখিন বাবুদের নাট্য স্পৃহার ওপর অবিশ্বাস ধ্বনিত হয়।সকলে একত্রে সমবেত হয়ে একটি প্রকাশ্য স্থানে নাট্যমন্দির প্রস্তুত করে বেতনভোগী নট-নটী দেখে অভিনয়ের দাবী জোরালো হয়।বেশ ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে মঞ্চের গণতন্ত্রীকরণের প্রয়াস এইসময় শিক্ষিত বাঙালির

মধ্যে জেগে উঠেছিল।এর ফলে একদিকে যেমন ধনীদের খেয়ালখুশি থেকে নাটক অভিনয়কে মুক্ত করা যেত,তেমনভাবেই সর্বস্তরের বাঙালি দর্শককে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একত্রিত করা সম্ভব হতো।এই উদ্যোগে নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আসলে তাদের কাছে নাটক শুধুমাত্র প্রমোদ বা বিলাস চর্চার উপকরণ ছিল না।নাটক এরা মূলত সমাজ সংস্কারের অস্ত্র হিসেবে দেখতে চাইলেন।এই আর্তির বহিঃপ্রকাশ শখের নাট্যশালার অভিনয়গুলিতেই যে প্রাথমিকভাবে মূর্ত হয়ে উঠতে থাকে তা পূর্বের অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে।পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় জোড়াসাঁকো থিয়েটার প্রভৃতি কয়েকটি রঙ্গালয়ে সমাজ সমস্যামূলক নাটকের অভিনয় আয়েজিত হতে থাকে।বাংলা থিয়েটার ধীরে ধীরে কলকাতা থেকে চুঁচুড়া,চন্দননগর,কৃষ্ণনগর,ঢাকাসহ অন্যান্য শহর কিংবা গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে।এবারে প্রয়োজন ছিল আরেকটু বড় উদ্যোগের। যে উদ্যোগের কেন্দ্রে থাকবেন বাঙালী মধ্যবিত্ত।ধনীর অর্থানুকুল্যে নয়,বরং তাদের অকৃপণ উদ্যোগের ফলেই গঠিত হবে বাঙালির স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ যেখানে সর্বপ্রকার বাংলা নাটকের অভিনয় কে কেন্দ্র করে তার নতুন জীবনবোধ,আদর্শ ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অভিলাষ চরিতার্থ হবে।বাংলা রঙ্গালয় হয়ে উঠবে বৃহত্তর বাঙালি জনতার সম্মিলিত আনন্দক্ষেত্র।

৬.২ বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার

বাগবাজার অঞ্চলের কয়েকজন উৎসাহী যুবকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার'। বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসের সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দেএই থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়।মূল সদস্যরা হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ,নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,মহেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়,রাধামাধব কর,অরুণ চন্দ্র হালদার প্রমুখ। পরে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ও এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। মনে রাখতে হবে এতদিন রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটক অভিনয়ের খরচ যুগিয়ে এসেছিল ধনী,বিত্তবান বাঙালি।থিয়েটারের মঞ্চনির্মাণ,দৃশ্যসজ্জা,সাজপোশাক,আলোর ব্যবহার কিংবা ঐক্যতান-

বাদন এই সমস্ত কিছুর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ছিল তাহার যোগান দেওয়ার মত সাধ্য বাঙালি মধ্যবিত্তের ছিলনা। বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের প্রথম অভিনয় স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করে হয়নি।অস্থায়ী ধরনের মঞ্চে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাটক দিয়ে ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয়। এই থিয়েটার মোট সাতবার 'সধবার একাদশী'র অভিনয় করে। রায়বাহাদুর রামপ্রসাদ মিত্রের বাড়িতে অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে এই নাটকের চতুর্থ অভিনয় সবথেকে বেশি প্রশংসা লাভ করে। গিরিশচন্দ্র নিমচাঁদ, অর্ধেন্দুশেখর জীবনচন্দ্র,নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় অটল,রাধামাধব কর রামমাণিক্য,নন্দলাল ঘোষ কাঞ্চনের ভূমিকায় অভিনয় করেন।দর্শক হিসেবে উপস্থিত নাট্যকারকে এই অভিনয় অত্যন্ত বিমোহিত করে।গিরিশ এবং অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ের প্রতিক্রিয়ায় তিনি তাঁর মুগ্ধতা ব্যক্ত করেন।গিরিশচন্দ্র লিখেছেন -

"জীবনচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং গ্রন্থকার অর্ধেন্দুকে বলেন, আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন,উহা Improvement on the author.আমি এবার সধবার একাদশীর নূতন সংস্করণে অটল কে লাথি মারি এবং লিখে দিব।"

- 'সধবার একাদশী' র সপ্তম তথা শেষ অভিনয়টি হয়েছিল ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে চোরবাগানে লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়িতে।এরপরে এখানে দীনবন্ধুর 'বিয়েপাগলা বুড়ো' নাটকটিও অভিনীত হয়।

প্রায় বছর খানেক অভিনয় বন্ধ থাকার পর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ১১ই মে দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় দিয়ে এই যুবকেরা আরো একবার দর্শক এবং সম্ভ্রান্তদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।নাটকটি শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রলাল পালের বাড়িতে স্টেজ বেঁধে অভিনীত হয়েছিল।চাঁদা তুলে অভিনয় সম্পন্ন হয়।দৃশ্যপট অঙ্কন করেছিলেন ধর্মদাস সুর।সাহেবদের অলিম্পিক থিয়েটারের আদর্শে মঞ্চনির্মাণ করা হয়েছিল।হরবিলাস এবং দাসীর ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর,গিরিশের ললিতমোহন,নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেমচাঁদ,রাধামাধবের ক্ষীরোদবাসিনী এবং সুরেশচন্দ্রের লীলাবতীর অভিনয় অত্যন্ত প্রশংসা অর্জন করে।এর আগে চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকারের উদ্যোগে মল্লিক বাড়িতে 'লীলাবতী'র অভিনয় সকলের সমাদরণীয় হয়েছিল। কিন্তু নাট্যকার

দীনবন্ধু নিজে বাগবাজারের যুবকদের অভিনয় দেখার পর মন্তব্য করেছিলেন যে চুঁচুড়ার তুলনায় তাঁদের অভিনয় ভালো হয়েছে।

লীলাবতীর অভিনয় নৈপুণ্য সকলের মুখে মুখে এতটাই ছড়িয়ে পড়ে একই মঞ্চে পরপর কয়েকটি শনিবার অভিনয় চালিয়ে যেতে হয়। প্রত্যেকটি অভিনয়েই বিপুল পরিমাণ দর্শকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ফলে স্থান সংকুলানের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। দর্শকসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যই টিকিট বিক্রি করে অভিনয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে।এডুকেশন গেজেট পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে এই অভিমত ব্যক্ত হয় -

" এই নাট্যাভিনেতৃগণ এমন একটি দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন করিতে পারেন যেখানে লোকে ইচ্ছা করিলে টিকিট ক্রয় করিয়া যাইতে পারে এবং দেশের অনেকটা সামাজিকতার পরিচয় হয়।" (৭ই জ্যৈষ্ঠ,১৩৭৯ সন)

- ফলত 'লীলাবতী'র অভিনয় সাফল্যের সময় থেকেই বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' নামে পরিচিতি লাভ করে।যে দীনবন্ধুর নাটক সৌখিন নাট্যশালায় কোনোভাবেই গৃহীত হয়নি,তা এই শ্যামবাজার নাট্যসমাজের অভিনেতাদের কাছে অত্যন্ত আদৃত হয়েছে।আসলে সমাজভাবনার প্রকাশ,বাস্তবধর্মিতা,ব্যয়বাহুল্যহীনতার কারণেই দীনবন্ধুর নাটকগুলি এই শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়কে সহজে আকর্ষণ করেছিল।তাঁদের মানসিকতার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে নাটকে প্রগতিমনস্কতার পরিচয় তুলে ধরার কারণেই গিরিশচন্দ্র পরবর্তীকালে 'রঙ্গালয় স্রষ্টা' দীনবন্ধুর ঋণ স্বীকার করে নিয়েছেন।

৬.৩ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের যুবকেরাই ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।এর পূর্বেই আমরা জেনেছি যে তৎকালীন সময়ের পত্রপত্রিকাগুলিতে নাট্যরস আস্বাদনে উন্মুখ একাধিক বিশিষ্ট মানুষেরা একটি সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার দাবী তুলতে শুরু করেছিলেন।শখের নাট্যশালায় মালিকের খেয়ালখুশি

মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো নাট্যকারের যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।তিনি যথার্থভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে একটি নাটক রচনা এবং তার অভিনয়ের অগ্রগতির স্বার্থে একটি জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রয়েজন রয়েছে।১৮৬০ সালের ২৪শে এপ্রিল একটি পত্রে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখেছেন -

"You know that as yet we have not established a National Theatre,I mean we have not as yet got a body of sound,classical dramas to regulate the national taste,and therefore we ought not to have farces."

- মধুসূদন যে অর্থে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার কামনা করেছিলেন,বাগবাজারের যুবকগোষ্ঠীর উদ্যোগের প্রকৃতি তার থেকে অনেকাংশে পৃথক ছিল।এই বক্তব্য ন্যাশনালের থিয়েটারের ক্ষেত্রেও সত্য।যাইহোক লীলাবতীর সাফল্যে উজ্জীবিত বাগবাজার অ্যামেচারের সদস্য-অভিনেতারা টিকিট বিক্রি করে অভিনয়ের কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন।তাঁদের শুভানুধ্যায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের অভিমতও সেরকমই ছিল।সংবাদপত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তাঁদের অভিনয়ের সংবাদ যথেষ্টভাবেই প্রচারিত হতে থাকে।ফলে নানান দিকের প্রয়োজন ও তাগিদে,নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁরা টিকিট বিক্রির পরিকল্পনা গ্রহণ করে।গিরিশচন্দ্র এই প্রচেষ্টায় আপত্তি জানিয়ে দল ছেড়ে চলে যান।এরপরেই নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়,মতিলাল সুর,রাধামাধব কর,অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি,অমৃতলাল বসু,ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সহ বাকিদের উদ্যোগে চিৎপুরে মধুসূদন সান্যালের বিরাট প্রাসাদের বহির্বাটির অঙ্গনটি মাসিক চল্লিশ টাকার বিনিময়ে ভাড়া নিয়ে সেখানে একটি অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করা হয়।এই নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন ধর্মদাস সুর,সহকারী ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।এই মঞ্চে গিরিশচন্দ্র ছাড়াই 'নীলদর্পণ'নাটকের প্রস্তুতি সময়,১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দলের নতুন নামকরণ করা হয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার'।যদিও ইংলিশম্যান পত্রিকার বিজ্ঞাপনে প্রস্তাবিত নাম দেখা যায় 'দি ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি'।সুলভ সমাচার পত্রিকাতেও দলের নাম 'কলকাতা ন্যাসলেল থিয়েট্রিকেল সোসাইটি' বলেই উল্লিখিত

হয়।ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মতে ন্যাশনাল থিয়েটার নামটি এই দীর্ঘ নামেরই সংক্ষিপ্ত রূপ।

যাইহোক এই সমস্ত প্রয়াসের মধ্যেই এই থিয়েটার পাগল যুবকেরা সদ্য প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল থিয়েটারে টিকিট বিক্রি করে 'নীলদর্পণ' নাটকাভিনয়ের আয়োজন করে।এই অভিনয়ের সাথে সাথেই প্রাসাদ মঞ্চের ঘেরাটোপ থেকে বাঙালীর রঙ্গালয় ইতিহাসের নতুনতর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়।

৬.৪ অভিনয়ের বর্ণনা

নীলদর্পণ নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়েই ন্যাশনাল থিয়েটার তার পথ চলা শুরু করে। সেক্রেটারি নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে প্রথম অভিনয় হয় ৭ই ডিসেম্বর,১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে।অভিনয় শিক্ষক ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি।

'নীলদর্পণ'-এর অভিনয় বাঙালির পূর্ববর্তী প্রতিটি নাট্য প্রচেষ্টাকেই ছাপিয়ে গিয়েছিল। অর্থের অভাবে মঞ্চ,দৃশ্যসজ্জা নির্মাণ ও আলোক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা চোখে পড়লেও উপস্থাপনা এবং অভিনয়ের গুণে সকলের দ্বারাই উচ্চ প্রশংসিত হল। সবথেকে বড় কথা নাটকটিতে একাধিক চরিত্রে অর্ধেন্দুশেখরের অসামান্য অভিনয় বাংলা থিয়েটারের আগামীর উজ্জ্বল দিন গুলিকে নিশ্চিত করেছিল।তিনি কখনো উড সাহেব,কখনো গোলক বসু,কখনো সাবিত্রী বা সামান্য চাষার রায়তের ভূমিকায় অভিনয়ে একাই দর্শককে মাতিয়ে তুললেন।

এই নাট্যাভিনয়টি কর্তা-ব্যক্তিদের পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়,কারণ নাটকের ঘটনা অনিবার্যভাবেই দর্শককে আকর্ষণ করেছিল।'লীলাবতী'র সাফল্যের পর থেকেই থিয়েটার কর্তৃপক্ষ উৎসাহিত হয়ে প্রতি শনি ও বুধবারে নাটকের অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকে।প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন নাটক প্রযোজনার সুবিধার্থে তখন থেকেই মঞ্চে প্রম্পটার গৃহীত হয়।১৮৭২ এর ডিসেম্বর মাসেই এই নাট্যশালায় পরপর অভিনীত হয় 'নীলদর্পণ'(৭ই ডিসেম্বর),'জামাই বারিক'(১৪ই ডিসেম্বর), 'নীলদর্পণ'(২১ শে ডিসেম্বর)

এবং 'সধবার একাদশী'(২৮শে ডিসেম্বর)।এগুলির পুনরাভিনয়ের সঙ্গে পরের বছর এই নাট্যশালায় 'নবীন তপস্বিনী','লীলাবতী', 'বিয়েপাগলা বুড়ো', 'নবনাটক','নয়শো রুপেয়া' প্রভৃতি নাটকগুলি অভিনীত হয়েছিল।

'নীলদর্পণে'র প্রথম অভিনয়ে প্রথম শ্রেণী,দ্বিতীয় শ্রেণী,রিজার্ভ সিট এবং দালানের সিঁড়িতে বসলে টিকিটের মূল্য ছিল যথাক্রমে এক টাকা,আট আনা,দুই টাকা এবং চার আনা। প্রথমে মোট দু'শো টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল।দ্বিতীয় অভিনয়ে টিকিট বিক্রি হয়েছিল প্রায় সাড়ে চারশো টাকার। এইভাবে উত্তরোত্তর দর্শকের ভিড় রঙ্গালয়ে বাড়তেই থাকল। বহু মানুষ টিকিট না পেয়ে ফিরে যেতে লাগলেন।এই নাট্যমঞ্চে অভিনীত হওয়ার ফলে দীনবন্ধু মিত্র সেসময়ের প্রধান নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়েছেন।অন্যদিকে প্রথম শ্রেণীর চরিত্রাভিনেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি।

সূচনালগ্নে থিয়েটার পরিচালনা থেকে গিরিশচন্দ্র নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এবারে তিনি ফিরে এসে দলে যুক্ত হলেন।১৮৭৩ এর ২২শে ফেব্রুয়ারি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করলেন।একটি নাটকে বাংলা থিয়েটারের দুজন প্রধান পুরুষ গিরিশচন্দ্র এবং অর্ধেন্দুশেখরের উপস্থিতিতে উচ্ছ্বসিত সাধারণ দর্শক সর্বতোভাবে ন্যাশনাল থিয়েটারের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করলো।

অথচ এরপর ন্যাশনাল থিয়েটারের দ্বারা স্থায়ীভাবে বেশিদিন অভিনয় চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।দলে একাধিক বিষয় নিয়ে সংঘাত দেখা যায় যার ফলশ্রুতিতে ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙে যায়।তার আগে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মার্চ এই রঙ্গালয়ের শেষ অভিনয়টি অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ','যেমন কর্ম তেমনি ফল' নাটক দুটির অভিনয়সহ কিছু প্যান্টোমাইম, রঙ্গ-ব্যঙ্গ-প্রহসন,মুস্তাফি সাহেব কা পাক্কা তামাশা, বিহারীলাল বসুর সঙ্গীত প্রভৃতি পরিবেশন করা হয়।

৬.৫ সংঘাত এবং ফলশ্রুতি

ন্যাশনাল থিয়েটার তৈরী হয়েছিল নিজ স্বার্থ বিষয়ে উদাসীন কয়েকটি নাটক পাগল যুবকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে।অথচ পেশাদারী থিয়েটারের থেকে প্রকৃতিগতভাবে ভিন্নতা থাকার কারণেই এখানে নানান বিরোধ এসে উপস্থিত হয়।এই বিরোধের সূত্রপাত প্রথমেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল টিকিট বিক্রি করার পরিকল্পনার সময়।সেই বার গিরিশচন্দ্র নিজে দলত্যাগ করে গিয়েছিলেন।কিন্তু অভিনয় শুরুর কিছু সময়ের মধ্যেই ন্যাশনাল থিয়েটার যখন জনতার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা লাভ করে তখন গিরিশ ঘোষ পুনরায় দলে যুক্ত হয়ে পড়েন।তাঁর অবর্তমানে ন্যাশনাল থিয়েটারের সাংগঠনিক বিষয় দেখভালের দায়িত্ব ছিল নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। অভিনয়গত দিক পরিচালনা করতেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি।গিরিশ পুনরায় দলে যোগদান করার পরেই কর্তৃত্ব নিয়ে দলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। বিশেষত তাঁর সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার দাদা দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায়।তাছাড়া অভিনয়কে কেন্দ্র করে খ্যাতি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল।তাকে কেন্দ্র করেও দলের মধ্যে মনোমালিন্য সঞ্চারিত হয়।মধ্যবিত্ত মানসিকতার কারণেই নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠে।তাছাড়া একই দলে অর্ধেন্দুশেখর এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতো মতো নট-নাট্যকার একই সাথে উপস্থিত থাকলে ব্যক্তিত্বের সংঘাত হওয়াটাও খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।ফলে ন্যাশনাল থিয়েটারের মধ্যে দুটো স্পষ্ট বিভাজন ধরা পড়ল,যার একদিকে রইলেন অর্ধেন্দুশেখর ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,অন্যদিকে রইলেন গিরিশ ঘোষ স্বয়ং।তাছাড়া আগামী কিছু বছরের মধ্যেই বাংলায় বাণিজ্যিক থিয়েটারের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।সেক্ষেত্রে থিয়েটার পরিচালনা কিংবা তার লভ্যাংশের বিষয়ে সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা বিত্তবান বণিকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ন্যাশনাল থিয়েটার কোনভাবেই পেশাদারী বা বাণিজ্যিক থিয়েটার ছিলনা। আবার শৌখিন নাট্যশালার সঙ্গেও এর প্রকৃতিগত স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।তাই যুগের একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তারা অনেক প্রশ্নেরই সমাধান খুঁজে পাননি।যেমন টিকিট বিক্রির ফলে যে উপার্জন হচ্ছিল তা দিয়ে মঞ্চ ও নাটকাভিনয়ের

জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়পত্র এবং অনেকের ব্যক্তিগত অর্থের চাহিদা মেটাবার পরেও কিছু উদ্বৃত্ত থেকে যেত।একে কেন্দ্র করে অনেকের মধ্যে প্রলোভন জেগে ওঠে।নাটকের সাজ-সরঞ্জাম,হিসাবপত্র ঠিক রাখা,টাকার ভাগ সমস্ত কিছু নিয়ে মতান্তর এবং তা থেকে মনান্তর নিত্য হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত কিছুর ফলেই ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই মার্চ শেষ অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটার এর প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

ন্যাশনাল থিয়েটার এর দ্বিতীয় পর্বের কথা বলতে গেলে আমরা দুটি আলাদা দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করি।একদিকে ন্যাশনাল থিয়েটার নাম ও স্টেজের সরঞ্জাম,দৃশ্যপটের স্বত্বাধিকারী হিসেবে রইলেন গিরিশচন্দ্র,ধর্মদাস সুর,মহেন্দ্রলাল বসু,মতিলাল সুর,তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা।অন্যদিকে অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়,কিরণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়,ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের উপস্থিতিতে পরিচালিত দলটি হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার নামে অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকে।এই দলটির প্রযোজনাগুলির মাধ্যমে নাট্যাভিনয় কলকাতার কেন্দ্রস্থল থেকে রাজশাহী,বোয়ালিয়া,রামপুর,বহরমপুর,ঢাকা প্রভৃতি স্থানে পরিব্যাপ্ত হয়।১৮৭৩ সালের ৭ই ডিসেম্বর দুটি দলই আলাদা আলাদা করে বাৎসরিক উৎসব পালন করে।হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার দল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার রূপে আত্মপ্রকাশ করে এর কিছুদিনের মধ্যেই।১৮৭৩-এর ৩১শে ডিসেম্বর ধনী ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে প্রস্তুত এই থিয়েটারটির উদ্বোধন হয় অমৃতলাল বসু রচিত 'কাম্যকানন' নাটকটির অভিনয়ের মাধ্যমে।এরপর অমৃতলাল বসু এবং উপেন্দ্রনাথ দাস দুজনে মিলে কিছুদিন থিয়েটারটি পরিচালনা করেছিলেন।স্বদেশভাবমূলক কিছু নাটকের অভিনয়ের কারণে এই থিয়েটার রাজরোষের শিকার হয়।শেষ পর্যন্ত বহুবার মালিকানা বদলের পর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নিলামে ওঠে।ব্যবসায়ী প্রতাপচাঁদ জহুরী এই থিয়েটার কিনে নেওয়ার সাথে সাথেই বাংলা থিয়েটার পাকাপাকিভাবে বাণিজ্যিক থিয়েটারে পরিণত হয়।

৬.৬ মূল্যায়ন

জার অ্যামেচার থিয়েটার থেকে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মধ্যে নিছক শখ-শৌখিনতা থেকে পেশাদারিত্বে উত্তরণের কিছুটা ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকলেও ন্যাশনাল থিয়েটার কোন

পেশাদারী থিয়েটার ছিল না। এই থিয়েটার উচ্চবিত্তের খামখেয়ালীপনার থেকে বাংলা নাটককে মুক্ত করেছিল,বাঙ্গালী সর্বসাধারণকে দিয়েছিল প্রকৃত নাটকের আস্বাদ।

এই দলের অধিকাংশ সদস্য ছিলেন বেকার। কেউই স্রেফ অর্থ প্রাপ্তির আশায় থিয়েটারে আসেননি। নাটকের প্রতি তাদের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল যা তাদের থিয়েটারে টেনে এনেছিল।একই সাথে ছিল মধ্যবিত্তের যুগ-মানসিকতার প্রতিফলন। ভালো নাটকের সন্ধান বাঙালিকে অনেক বেশি পরিমাণে রঙ্গালয়মুখী করেছিল।ফলে নাট্যগোষ্ঠীর যুবকদের অচিরেই নাট্যাভিনয় দর্শনে আগত জনতার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় খুঁজতে হলো। বেশ কয়েকবার ব্যর্থ হওয়ার পর দর্শক নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা টিকিট বিক্রির বন্দোবস্ত করলেন।এই ঘটনা শৌখিন থিয়েটারের থেকে পেশাদারি থিয়েটারে উত্তরণের একটি বড় বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত হতে পারে।কিন্তু মনে রাখা দরকার নাট্য গোষ্ঠীর কোন সদস্য তখন অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি।তাঁরা সকলেই ছিলেন অবৈতনিক। যদিও আর্থিক প্রয়োজনীয়তার জন্য কাউকে কাউকে উদ্বৃত্তের থেকে অর্থ সাহায্য করা হতো। কিন্তু সে নিয়ম সকলের জন্য প্রযোজ্য ছিল না।ফলে ন্যাশনাল থিয়েটার কে পেশাদারী বলবার ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা রয়েছে।

প্রকৃতিগত দিক থেকে এটি ব্যবসায়িক থিয়েটারও নয়।কেননা ব্যবসায়িক থিয়েটারের মূল বৈশিষ্ট্যটি হল,সেখানে একজন ব্যক্তি নাট্যাভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত মূলধনের বিনিয়োগ করবেন এবং সেই লগ্নীকৃত অর্থ থেকে যা কিছু মুনাফা হবে তাতে কেবলমাত্র থাকবে সেই মালিকের অধিকার।এরকম কোন উদ্দেশ্য ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যোগে ছিল না।ফলে খুব স্পষ্টভাবেই এই থিয়েটারকে ব্যাবসায়িক থিয়েটারের অভিধার বহির্ভূত রাখা যেতে পারে।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে ধরণের জাতীয় নাট্যশালার কথা বলেছিলেন তার সঙ্গে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রভেদ রয়েছে।পরবর্তীকালে সমালোচকদের মধ্যে একাধিকবার এই থিয়েটারের জাতীয় প্রকৃতিটির বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হয়েছে।শুধুমাত্র নামের সঙ্গে 'ন্যাশনাল' শব্দটি জুড়ে যাওয়ার কারণে এই

রঙ্গানয়কে কতটা 'জাতীয় থিয়েটার' বলা যুক্তিযুক্ত তা বিচার করে দেখবার প্রয়োজন আছে।মনে রাখা দরকার ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিটি নাট্যপ্রচেষ্টাই বাস্তবায়িত হয়েছিল ব্রিটিশদের অধীনস্থ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে।এই সময়ে বাংলা,মহারাষ্ট্রসহ দেশের কয়েকটি প্রান্তে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও জাতীয়তাবোধের অঙ্কুর স্ফূরিত হতে দেখা যায়।বাংলাদেশে হিন্দু মেলার সূচনা হয় নবগোপাল মিত্রের হাত ধরে। এই নবগোপাল মিত্র ছিলেন ন্যাশনাল থিয়েটার একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক।ন্যাশনালের চিন্তায় তিনি মগ্ন ছিলেন।আবার এই থিয়েটারের আরো দুই উপদেষ্টা মনোমোহন বসু এবং শিশিরকুমার ঘোষও জাতীয় ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন।এদের সকলের সমবেত চেষ্টায় গড়ে ওঠা ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে যে জাতীয় ভাবের ওতপ্রোত যোগাযোগ থাকবে তা বলা বাহুল্য।কিন্তু মনে রাখতে হবে ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতা-সদস্যদের মধ্যে যে আবেগ ছিল তার মধ্যে জাতীয় ভাবের প্রকাশ থাকলেও তার থেকে অনেক বেশী পরিমাণে বাংলা নাটককে বড়লোকের গন্ডি থেকে সাধারণ জনমানুষের মধ্যে মুক্ত করে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল।এই থিয়েটারই প্রথম 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় করে যার মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবোধের একটা প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়,কিন্তু তবুও এদের প্রয়াস সংকীর্ণ জাতীয়তার পর্যায়েই আবদ্ধ ছিল।এঁরা শৌখিন নাট্যশালার থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থিতি সুনিশ্চিত করার জন্যই ন্যাশনাল থিয়েটার নাম গ্রহণ করেছিলেন।তাই প্রকৃত অর্থে জাতীয় নাট্যশালা বলতে যা বোঝায় এই রঙ্গালয়টি সেরকম ছিলনা।

আত্মপ্রকাশের প্রথমে এই নাট্যশালাটি সর্বস্তরের জাতীয় ভাবাপন্ন মানুষের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করলেও অচিরেই সেই সম্পর্কসূত্রটি ছিন্ন হয়ে যায়।মঞ্চে নারী অভিনেত্রীদের আবির্ভাবের কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই এই রঙ্গালয় ব্রাহ্মসমাজের সমর্থন হারায়।ইন্ডিয়ান মিরর,সুলভ সমাচার,ভারত সংস্কারক প্রভৃতি পত্রিকায় নানান বিরূপ মন্তব্য স্থান পেতে থাকে। বিশিষ্ট চিন্তানায়ক এবং কর্মবীর বিপিনচন্দ্র পাল লিখছেন -

"The Brahmos as a class considered it sinful to attend the performances of these public woman."

- ফলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে কিছুদিনের মধ্যেই সমাজের রক্ষণশীল একটি বড় অংশ এই নাট্যাভিনয়ের বিরোধিতা করতে থাকে।সমস্ত দিক বিবেচনা করে তাই বলা যায় ন্যাশনাল থিয়েটার 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় করলেও একে সর্বতোভাবে জাতীয় রঙ্গালয়ের মর্যাদা দেওয়া যায় না। মূলত শৌখিন থিয়েটার থেকে পেশাদারী থিয়েটার এবং ব্যবসায়িক থিয়েটারে উত্তীর্ণ হওয়ার মাঝখানে এই বাঁকবদলের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হিসেবেই এর ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে।

৬.৭ বেঙ্গল থিয়েটার

শনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়।৯ নং বিডন স্ট্রীটে ইংরেজি লিউইসের লাইসিয়াম থিয়েটারের অনুসরণে এই নাট্যশালাটি নির্মিত হয়।প্রধান উদ্যোক্তা সাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ। অন্যান্য উদ্যোগ এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়,দেবেন্দ্রনাথ মিত্র,অক্ষয়কুমার মজুমদার,হরিবৈষ্ণবসহ আরো অনেকে।বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং উমেশচন্দ্র দত্ত। এছাড়া থিয়েটার পরিচালনার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি তৈরি করা হয় যেখানে মধুসূদন,বিদ্যাসাগর,দেবব্রত সামশ্রমী, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখেরা ছিলেন।

১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধন হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। প্রথম অভিনয়েই সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল নারী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য মঞ্চে অভিনেত্রী গ্রহণ।

'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয়ের পর এখানে রামনারায়ণের 'স্বপ্নধন','যেমন কর্ম তেমনি ফল',বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়।এই থিয়েটারের জন্যই অসুস্থ মাইকেল 'মায়াকানন' নাটকটি রচনা করেন।'বিষ না ধনুর্গুণ' নাটকটিও এদের জন্য লেখা শুরু করলেও শেষ করা যায়নি।বেঙ্গল থিয়েটারের সাফল্য সূচিত হয় লক্ষীনারায়ণ দাসের

'মোহান্তের এই কি কাজ' নাটকটি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে।এরপর থেকে এই থিয়েটারে একের পর এক রামনারায়ণের 'চক্ষুদান','রত্নাবলী',মধুসূদনের 'পদ্মাবতী', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম',হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান',নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সতী কি কলঙ্কিনী' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হতে থাকে।এই মঞ্চেই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র গিরিশচন্দ্র কৃত নাট্যরূপটিও অভিনীত হয়েছিল।বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গুলির নাট্যরূপ অভিনয়ের ক্ষেত্রে বেঙ্গল থিয়েটার বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিল।১৮৭৩ থেকে ১৮৭৬ - এই অল্প সময়কালের মধ্যেই 'গুইকোয়ার নাটক','সুরেন্দ্র বিনোদিনী','বীরনারী', 'বঙ্গবিজেতা','পলাশীর যুদ্ধ'-এর মতো স্বদেশাত্মক ও ঐতিহাসিক ধারার নাটকগুলি অভিনীত হচ্ছিল,কুখ্যাত অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হওয়ার পর যা বন্ধ হয়ে যায়।১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে এই থিয়েটারের প্রাণপুরুষ শরৎচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর পর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তাদের মধ্যে থেকে অগ্রণী বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় অভিনয়,পরিচালনা,অভিনেতা-অভিনেত্রী জোগাড় সহ সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন।তাঁর অপরিসীম উদ্যোগের কারণেই বেঙ্গল থিয়েটার ১৯০১ পর্যন্ত অভিনয় চালিয়ে যেতে পেরেছিল।কিন্তু নট-নটীদের থিয়েটার ত্যাগ,উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের প্রবীণ সদস্যদের মৃত্যু,জমির বিবাদ এবং সর্বোপরি ব্যবসায়িক থিয়েটারের উত্থানে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার ফলে বেঙ্গল থিয়েটারের অবস্থার বহুলাংশে অবনতি ঘটে।১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সাথে সাথেই এই রঙ্গালয়ের শেষ নির্ভরতাটুকুরও অবসান ঘটে।ফলে ঠিক তার আগামী দিন অর্থাৎ ২১শে এপ্রিল একটি ছোট নাটক ও নক্সা অভিনয়ের পর আর কখনও এই মঞ্চে আলো জ্বলেনি।

৬.৮ অনুশীলনী

১. বাংলা নাটকাভিনয়ের ইতিহাসে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের বিবরণ দাও।

২. 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার' থেকে 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ উতেতীর্ণ হওয়ার মধ্যে দিয়ে পেশাদারি এবং ব্যবসায়িক মনোভাবের কতটা প্রভাব ছিল।

৩. 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ নাটকাভিনয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।এই থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এর তাৎপর্যের দিকটি ব্যাখ্যা কর।

৪. ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয়ের বর্ণনা দাও।এই থিয়েটারের স্থায়িত্ব এবং রূপান্তর সম্পর্কে আলোকপাত কর।

৬.৯ গ্রন্থঋণ

১. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস - দর্শন চৌধুরী

২. বাংলা নাটকের বিবর্তন - সুরেশচন্দ্র মৈত্র

৩. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস - শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

৪. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর - অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৫. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য়) - আশুতোষ ভট্টাচার্য

৬. ভারতীয় নাট্যমঞ্চ - হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

৭. বাংলা থিয়েটার - কিরণময় রাহা

একক ৭ – অভিনয় নিয়ন্ত্রন আইন এবং ব্যবসায়িক থিয়েটারের উত্থান

বিন্যাস ক্রম

৭.১ ভূমিকা

৭.২ বাংলা নাটকে স্বদেশাত্মক চিন্তাধারা

৭.৩ অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন

৭.৪ রঙ্গমঞ্চে প্রভাব

৭.৫ ব্যবসায়িক থিয়েটারের উত্থান

৭.৬ গুর্মুখ রায়ের স্টার থিয়েটার

৭.৭ এমারেল্ড থিয়েটার

৭.৮ অনুশীলনী

৭.৯ গ্রন্থঋণ

৭.১ ভূমিকা

৭.১ ভূমিকা

সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই বাংলা নাটকাভিনয় একটি নতুনতর যুগে পদার্পণ করলো।মধ্যবিত্ত বাঙালির মানসলোক তখন জাতীয় ভাবনার দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছে।সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর অভ্যুত্থান জাতীয় রাজনীতির

আবহে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। যে বাঙালি এতদিন মূক,নির্লিপ্ত হয়ে সমস্ত অবিচার মেনে নিয়েছে,তারা এবারে নিজেদের পরিস্থিতির দিকে সচেতন দৃষ্টিপাতের আবশ্যকতা অনুভব করেছে।ফলে সমস্ত কিছুর সাথে সাথেই তার নন্দনচিন্তাতেও এসেছে পরিবর্তন,বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টির বদলে সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার ফুটে উঠছে।

বাংলা রঙ্গালয়ের এটি একটি বিশেষ পর্ব,কেননা বাঙালির মানস পরিবর্তনের সমস্ত সাকেষ্য সে বহন করছে।এই সময়ে নাট্যকার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,শিশির কুমার ঘোষ,লক্ষীনারায়ন চক্রবর্তী,হরলাল রায়,নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,প্রমথনাথ মিত্র,উমেশচন্দ্র গুপ্ত এবং উপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখেরা।এঁদের নাটকে স্বদেশাত্মক ভাবধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।এই সময়ের একাধিক নাটকের ব্রিটিশবিরোধিতার সুর স্পষ্ট।অর্থাৎ সামাজিক অনাচার- অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপন প্রতিবাদ ব্যক্ত করার সময় রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করতেও মানুষ আর ভয় পাচ্ছে না।বাংলা নাটকের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সেই নির্ভীক বিরুদ্ধতার ভাব যদি বৃহত্তর গণমানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে,তবে নিজের শাসনতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা ব্রিটিশের আশু প্রয়োজন।তাই স্রেফ নাটকাভিনয়ের দ্বারা সনাতন এবং পিউরিটান মনে আঘাত করার ফলশ্রুতি হিসেবেই ১৮৭৬ সালে Dramatic Performances Act বা অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের অবতারণা হয়নি। বরং এর পিছনে ইংরেজ শাসকের আরো বৃহত্তর অভিসন্ধি লুকিয়ে ছিল।

৭.২ বাংলা নাটকে স্বদেশাত্মক চিন্তাধারা

শুধুমাত্র অর্থাভাবের কারণেই নবজাগ্রত বাঙালিকে শখের নাট্যশালায় বিত্তবান মালিকের খামখেয়ালিপনা মেনে নিতে হয়েছে।তাদের রুচি বহির্ভূত কোন নাটক তখনও পর্যন্ত বাংলার নাট্যমঞ্চে অভিনীত হতে পারেনি।ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা জাতীয়তার ভাবনায় উদ্দীপ্ত বাঙালিকে এই অধীনতা থেকে মুক্তি দিল,তার নিজস্ব থিয়েটারে সে স্বচ্ছন্দভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারল।ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত নাটকটি হল দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত সৃষ্টি 'নীলদর্পণ'।নাটকটি প্রকাশিত হবার সাথে

সাথেই ব্রিটিশ শাসকদের রোষদৃষ্টির মুখে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার এই গ্রন্থের বিরুদ্ধে মামলা করে এবং ১৮৬১ সালে পাদ্রী জেমস লং নাটকটির প্রকাশক হিসেবে এক মাসের জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানার শাস্তির কবলে পড়েন। যদিও সেই সময়ের অনেক বিশিষ্ট মানুষ এই শাস্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নানাভাবে নাটকটিকে আইনি সহায়তা প্রদানে তৎপর হয়েছিলেন।শাসকের পক্ষ থেকে 'নীলদর্পণ' নাটকের কিছু অংশকে সরাসরি মানহানিকর বলে সাব্যস্ত করা হয়। আসলে রঙ্গমঞ্চের প্রতি অনুরক্ত ইংরেজরা এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে সভা-সমিতি,আবেদন-নিবেদনের পাশাপাশি অভিনয়ের মাধ্যমে জাতীয় ভাবনা এবং ইংরেজ বিরোধিতাকে অনেক বেশি পরিমাণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। এতদিন পর্যন্ত তাদের আশঙ্কা অমূলক ছিল কারণ শখের নাট্যশালায় এমন কোন নাটকের অভিনয় সম্ভব হয়নি যা ঘোষিতভাবে সমাজপতি কিংবা সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে।কিন্তু ১৮৭২ সালে একদিকে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ,অন্যদিকে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে স্বদেশ সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ ও সুচিন্তিত মতামতগুলি অনেক বেশি পরিমাণে সংহত হওয়ার অবকাশ পেল।

ন্যাশনাল থিয়েটারের 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজদের নানান মহল থেকে তীব্র আপত্তি জানানো হয়।দরিদ্র বাঙালির ওপর নীলকর সাহেবের অমানবিক অত্যাচার,কৃষকের সাহেবকে আক্রমণের ঘটনা যখন মঞ্চে অভিনীত হলো তখন তা ব্রিটিশদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল।এই নাটকাভিনয় তো শুধু প্রকাশ্য মঞ্চে নীলকর সাহেবের অত্যাচারকেই দর্শক-জনতার কাছে উন্মোচিত করেনি,তা আরো অনেক মানুষকে শাসক,অত্যাচারীর সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।এরই ফলশ্রুতি হিসেবেই একাধিক দর্পণ নাটকের জন্ম হতে থাকে।এমনই একটি নাটক ছিল দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'চা-কর দর্পণ'। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে।অভিনয় সম্ভব হয়নি কারণ তার আগেই ব্রিটিশ সরকার এই বইয়ের বিষয়-বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন।'চা-কর দর্পণ' নাটকে যে চা-ব্যবসায়ীদের অত্যাচারের নগ্ন রূপ প্রকাশিত হয়েছিল তারা জাতিতে ছিলেন ইংরেজ। ফলে এই

নাটক জনসমক্ষে অভিনীত হলে তা যে বৃটিশের বাণিজ্যিক স্বার্থের ওপর প্রচন্ড আঘাত হবে তা বুঝে নিতে তাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি। অভিজাত ব্রিটিশ চা-ব্যবসায়ীদের রক্ষা করা তাদের আশু প্রয়োজন ছিল।পরবর্তীকালে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের যে খসড়াটি ল মেম্বর মি.হবহাউস সুপ্রিম লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে পেশ করেন তার প্রতিটি ছত্রে বাংলা নাটক ও মঞ্চের বৃটিশবিরোধী মনোভাবের সাক্ষ্য হিসেবে 'চা-কর দর্পণ'সহ একাধিক নাটকের উল্লেখ ছিল।

১৮৭২-১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই বাঙালীর রঙ্গমঞ্চে অভিনীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম',কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতে যবন',হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান', 'হেমলতা', নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুইকোয়ার',অমৃতলাল বসুর 'হীরকচূর্ণ',উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎসরোজিনী','সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' প্রভৃতি নাটকগুলিতে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কিংবা সাম্প্রতিক বিষয়কে অবলম্বন করে প্রত্যক্ষ বৃটিশ বিরোধিতার নিদর্শন রয়েছে।ফলে এইজাতীয় অভিনয় বন্ধের জন্য সরকার বিশেষ সচেষ্ট হয়েছিল।এই চেষ্টা বাস্তবায়িত হতে পারতো দুইভাবে,আইনের বলে এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা।পুলিশ-প্রশাসনকে ব্যবহার,হুমকি এবং ভয় দেখিয়ে করে যখন কোনোভাবেই এই ধরনের নাটকের অভিনয় বন্ধ করা গেল না তখন তাদেরকে আইনের কথা ভাবতে হয়েছে।এই উদ্যোগে তারা পাশে পেয়েছে তৎকালীন বাঙালির একটি বৃহত্তর অংশকে।বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রী গ্রহণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বাংলা রঙ্গালয়ের বিরুদ্ধে নীতিবাগিশ বাঙালী অশ্লীলতা এবং নোংরামির রব তোলে।এঁদের উদ্যোগেই ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউন হলে Society for the Suppression of Public Obscenity গঠিত হয়।এখানে সমাজের পিউরিটান মনোভাবপন্ন অংশ অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছিলেন।বক্তা ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেন,কালীচরণ বন্দোপাধ্যায়,হিন্দু সমাজের মুখ হিসেবে কালীকৃষ্ণ দেব প্রমুখেরা।সামাজিক সংস্কার এবং সমস্ত প্রকার অধীনতা থেকে মুক্তির যে আকাঙ্ক্ষা সেই সময় বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রতিফলিত হচ্ছিল তাকে এই সংগঠনের সদস্যরা সমর্থন করেননি।এই বিরোধিতার সর্বাগ্রে ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের

সভ্যবৃন্দ।অনেকের মতে তাঁদের বিরোধিতার পিছনে নৈতিক উদ্দেশ্যের সাথেই রাজনৈতিক কারণও ছিল -

"দেশের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার বেদনা কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার আসন্ন সহচরেরা তখনও অনুভব করেন নাই।তাঁদের বাধিয়াছিল প্রচলিত হিন্দুধর্মের অসত্য এবং হিন্দু সমাজের জাতিভেদের বেদনা।ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নতি করা ও ধর্ম সাধনেই তাঁহারা ব্যস্ত হইয়াছিলেন।বিদেশি শাসনের বিরাট অন্যায় -অবিচারের অনুভূতি তখন ভালো করিয়া জাগে নাই।কেশবচন্দ্র রবিবাসরীয় সামাজিক ব্রহ্মোপসনার সময় সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতেন।কিন্তু স্বদেশের জন্য বিশেষভাবে কোন প্রার্থনা করিতেন না।"

(সত্তর বৎসর - বিপিনচন্দ্র পাল)

- ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরে জাতীয় সংস্কৃতির কথা সর্বদা আলোচিত হলেও পেশাদারি রঙ্গালয়ে রাজশক্তি এবং তার সহযোগীদের সমালোচনা তাঁদেরকে বিচলিত করেছিল।তাই থিয়েটারের ওপর যখন শাসকের সংগঠিত আক্রমণ নেমে এল, তখন তাঁরা উদাসীন হয়ে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন।

তাছাড়াও সেই সময়ের অধিকাংশ নাটকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল ইংরেজের লেজুরবৃত্তি করা কিছু বাঙালি অভিজাত।তাদের ভণ্ডামী এবং কেচ্ছার অনেক সংবাদ সেই সময়ের প্রহসনগুলিতে প্রকাশিত হয়ে পড়ছিল।রাজকর্মচারী,বাঙালী বাবু,ধর্মধ্বজী ভণ্ড,লম্পট ও অত্যাচারী জমিদার সকলের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনের ক্ষেত্রে নাট্যকারেরা সংকোচ বোধ করতেন না।ফলে রঙ্গালয়ের অভিনয় এই সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ মানুষের চক্ষুশূল হয়।তারা নাট্যনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারকে সম্মিলিত সমর্থন জোগাতে থাকেন।এই প্রেক্ষাপটেই ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের অবতারণা হয়,যার উপলক্ষ্য হিসেবে সরকার কয়েকটি নাটকের অভিনয়কে চিহ্নিত করেন।

৭.৩ অভিনয় নিয়ন্ত্রন আইন

এই সময় মহারানী ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স অফ ওয়েলসের কলকাতায় আগমনকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তার একান্ত ইচ্ছা অভিজাত বাঙালি ভদ্রঘরের কুলবধূদের তিনি দেখবেন। বাংলাদেশের হিন্দুর কাছে তখন এটি একটি মারাত্মক প্রস্তাব। যদিও সেই সময় ইংরেজদের লেজুড়বৃত্তি করা রাজরক্ত প্রজার অভাব ছিল না। ফলে যুবরাজের পূরণের জন্য এগিয়ে এলেন হাইকোর্টের উকিল এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্য জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়।তার ভবানীপুরের বাড়ির অন্দরমহলের নারীরা যুবরাজকে বরণ করলেন। এই ঘটনা তৎকালীন সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে একদিকে হিন্দুধর্মের সংস্কার এবং অন্যদিকে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমে করার ফলে রক্ষণশীল এবং শিক্ষিত বাঙালি কেউই এই ঘটনাকে মেনে নিতে পারেননি।ফলে সমাজের নানা মহলে প্রতিবাদ ও সমালোচনার ঝড় ওঠে।বাংলা রঙ্গালয়ও তার থেকে দূরে থাকতে পারে।উপেন্দ্রনাথ দাস যাঁর নাটকে সেসময় জাতীয়তাবাদের সবথেকে তীব্র প্রকাশ ঘটেছিল,তিনি এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নাটকটি রচনা করলেন।১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী এই নাটকটি মঞ্চে অভিনীত হয়।

জগদানন্দ যে এই নাটকে গজদানন্দে পর্যবসিত হয়েছেন সে কথা বলা বাহুল্য।প্রিন্স অফ ওয়েলস হয়েছেন দিল্লীর অধিপতি হোরাঙ্গজীবের পুত্র।নাটকে ব্যবহৃত গানগুলির রচনাকর্তা ছিলেন গিরিশচন্দ্র।

'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নাটকটি সেই মাসের ২৩ তারিখ অমৃতলাল বসুর বেনিফিট নাইটে পুনরাভিনীত হয়।এই প্রথম ব্রিটিশ সরকার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং গজদানন্দ নাটকে রাজভক্ত সম্ভ্রান্ত প্রজাকে বিদ্রুপ করা হয়েছে এই অভিযোগে অভিনয় বন্ধ করে দেয়।গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃপক্ষ নাটকের মূল বিষয়কে একই রেখে কেবলমাত্র নাম পরিবর্তন করে আরো একবার অভিনয়ের আয়োজন করেন। কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশ সুপার মি.ল্যাম্ব এবং পুলিশ কমিশনার মি.স্টুয়ার্ট হগকে ব্যঙ্গ করে 'পুলিশ অফ পীগ এন্ড শীপ' নাটকটি অভিনীত হয়

উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের সাথে। সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটকে নায়ক সুরেন্দ্র ও লম্পট ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেলের পারস্পরিক সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে।সুরেন্দ্রের বোন বিরাজমোহিনীর ওপর সাহেবের জঘন্য অত্যাচারের প্রচেষ্টা এবং তার সাহেবকে পদাঘাতের দৃশ্য দর্শকপূর্ণ প্রেক্ষালয়ে অভিনীত হয়েছে।উপেন্দ্রনাথের 'শরৎসরোজিনী' নাটকের বিষয় ছিল আরো বেশী উত্তেজনাপূর্ণ।সেখানে মতিলাল নামক একজন দুশ্চরিত্রের ভোগবাসনাকে তৃপ্ত করার ক্ষেত্রে সে গোরাদের সঙ্গ পেয়েছে।এই নাটকে শরৎ মঞ্চের ওপরেই একজন গোরাকে গুলি করে মেরেছে।তার জন্য অনুতাপের বদলে সে সচেতনভাবে দোষ স্বীকার করেছে এবং বলেছে উৎপীড়িত স্বদেশবাসীকে ইংরেজের অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনে সে প্রাণবিসর্জন দিতেও প্রস্তুত।'শরৎসরোজিনী' নাটকে সরোজিনীর হাতেও অনুরূপ একটি গোরার হত্যার দৃশ্য রয়েছে।

সুতরাং ইংরেজ শাসকের কাছে এই ধরণের ঘটনাক্রম সমন্বিত নাটকের প্রকাশ্য অভিনয় ছিল সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ব্যাপার।তারা তাদের রাজ্যভোগকে দীর্ঘায়িত করার জন্য যে কোন প্রতিবাদের প্রচেষ্টাকেই অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন।ফলে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারী লর্ড নর্থব্রুক একটি অর্ডিন্যান্স জারি করলেন।নাটক এব নাট্যাভিনয় সম্পর্কে সেখানে স্পষ্টতই বলা হয় -

".....to empower the government of Bengal to prohibit certain dramatic performances, which are scandalaous,defamatory,seditious,obscene or otherwise prejudicial to the public interest."

- এর পরবর্তী ঘটনা হিসেবেই ৪ঠা মার্চ গ্রেট ন্যাশনালে 'সতী কি কলঙ্কিনী' এবং 'উভয়সঙ্কট' নাটকদুটি অভিনয়ের সময় পুলিশ রঙ্গালয় ঘিরে ফেলে এবং রঙ্গালয়ের অন্যতম ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু,অভিনেতা মতিলাল সুর,অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু,শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,গোপাল দাস এবং সঙ্গীতকার রামতারণ সান্যালকে গ্রেফতার করে।রঙ্গালয়েরর মালিক ভুবনমোহন

নিয়োগীকেও আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হয়।বিচারে উপেন্দ্রনাথ দাস এবং অমৃতলাল বসু দুজনেরই এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়।

রঙ্গালয়ের উপর নেমে আসা এই আঘাতে সেই সময়ের অনেক বিশিষ্ট মানুষ প্রতিবাদ করেছিলেন।কিন্তু তাতেও ইংরেজ সরকার ক্ষান্ত হননি।১৮৭৬-এর ১৫ই মার্চ তারিখে মি.হবহাউসের Dramatic Performances Control Bill আইনের খসড়াটি সুপ্রিম লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে পেশ করেন।অবশেষে ১৮৭৬-এর ১৬ই ডিসেম্বর বিলটি আইনে পরিণত হয়।রঙ্গমঞ্চে স্বাধীন মতামত প্রকাশের ওপর আঘাত রূপে এই আইন প্রথমে কলকাতায়,পরবর্তীতে দেশের সর্বত্র কার্যকরী হয়।

৭.৪ রঙ্গমঞ্চের প্রভাব

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের বলে ইংরেজ শাসক বাঙালির রঙ্গালয়ে যে কোন নাটকের বিচারকর্তা হয়ে ওঠে।কোন নাটকের কতখানি অভিনয়যোগ্য,কোন অংশটির অভিনয় করা যাবে না,কোন সংলাপ বাদ দিতে হবে - সেই সমস্ত কিছু ভিডিও আইন এবং পুলিশ প্রশাসনের দ্বারা নির্ধারিত হয়।এই আইনে যে কোন বাংলা পাবলিক থিয়েটার বা সাধারণ রঙ্গালয় এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী,মঞ্চাধ্যক্ষ্য,ম্যানেজার,থিয়েটার মালিক অর্থাৎ নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রকেই অভিযুক্ত ও শাস্তিযোগ্যের আওতায় এনে ফেলা হয়। আইনের বিধি লঙ্ঘিত হলে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার,জরিমানা এমনকি জেলের ব্যবস্থার সাথেই রঙ্গালয়ের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতাও পুলিশকে দেওয়া হয়।এমনকি আইনের ৬নং ধারা অনুযায়ী বিধিবহির্ভূত নাটকের দর্শকও অপরাধী বলে বিবেচিত হবেন এবং পরিণামে তার কারাবাস ও জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই আইনের অবতারণার ফলে রঙ্গালয়ে বাংলা নাটকের অভিনয় ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।নাট্যকার হিসেবে উপেন্দ্রনাথ দাসের বিকাশের সমস্ত সম্ভাবনা বিনষ্ট হয় এবং তিনি ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দেই বিলেত চলে যান।গ্রেট ন্যাশনালের মালিক ভুবনমোহন নিয়োগী সর্বস্ব হারিয়ে থিয়েটারের সঙ্গে সমস্তরকমের সংস্রব ত্যাগ করেন।অমৃতলাল আন্দামানে

চলে যেতে বাধ্য হন।অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আরো অনেকের স্বর স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং বাংলায় ব্যবসায়িক থিয়েটারের উত্থানের পথ প্রশস্ত হয়।

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তনের ফলে নাটকাভিনয়কে কেন্দ্র করে বাঙালী মধ্যবিত্তের স্বাধীন চিন্তাধারার প্রকাশ বহুলাংশে ব্যাহত হয়।এরপর প্রায় দুই দশকেরও বেশী সময় ধরে বাঙালীর থিয়েটারে স্বদেশভাবাপন্ন নাটকের অভিনয় সম্ভব হয়নি।রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে বাংলা রঙ্গমঞ্চ তখন সামাজিক,পৌরাণিক ভক্তিমূলক,গীতিনাট্য,প্রহসন ইত্যাদির অভিনয় চর্চায় মনোনিবেশ করেছে।সমাজ সংস্কার ও যুক্তিবাদের বদলে এই পর্বের নাটকে সনাতন ধর্ম এবং ভক্তিবাদের জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে।অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বিংশ শতকের প্রথমেই,বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে।ডিএল রায়,ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ নাট্যকারের নাটকে সেই জাগরণের ইঙ্গিত প্রকাশিত হতে লাগলো।রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এইসময় পথে নেমেছিলেন।তবে এত কিছুর পরেও স্বীকার করতেই হয় যে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাংলা রঙ্গমঞ্চের স্বাভাবিক বিকাশের পথকে রুদ্ধ করেছিল।এই আইনের ধারাবাহিকতায় ইংরেজরা 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট','আর্মস অ্যাক্টে'র মত আইন কার্যকর করে।প্রথমটির দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ এবং দ্বিতীয়টির বলে ভারতীয়দের নিরস্ত্রীকরণ সম্পন্ন হয়।এই সমস্ত দমনমূলক আইনের ক্ষেত্রেই পথ প্রদর্শক ছিল 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন'।

৭.৫ ব্যবসায়িক থিয়েটারের উত্থান

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রভাবে বাংলা রঙ্গালয় যখন বিপর্যস্ত সেই সময় প্রতাপচাঁদ জহুরি থিয়েটার এবং তার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটি মানুষকে নিয়ম এবং পেশাদারিত্বের বন্ধনে বাঁধার চেষ্টা করলেন।১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নীলামে উঠলে তিনি ২৫০০০ টাকার বিনিময়ে তা ক্রয় করে ন্যাশনাল থিয়েটার নামকরণ করেন।তার আবির্ভাবের সাথেই বাংলায় ব্যবসায়িক থিয়েটারের উত্থান ঘটে।এই প্রথম একজন পাকাপোক্ত ব্যবসায়ী বাংলা রঙ্গালয়ের মালিকানা লাভ করলেন।এর পূর্বে শরৎচন্দ্র ঘোষ বা ভুবনমোহন নিয়োগী কেউই তার মতো ব্যবসায়িক

দৃষ্টিতে থিয়েটারকে গ্রহণ করেননি।তাঁদের কাছে নাটকাভিনয়ের উত্তেজনাটুকুই প্রধান ছিল।কিন্তু প্রতাপচাঁদ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন অন্যান্য ব্যবসার মতো থিয়েটারেও মূলধন বিনিয়োগ করে তা থেকে বেশ ভালো পরিমাণ টাকা মুনাফা করা সম্ভব।এর জন্য দরকার সঠিক পরিচালনা এবং উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ।থিয়েটারে যত বেশি পরিমান দর্শক আসবেন ততটাই টিকিট বিক্রির বৃদ্ধি পাবে এবং লগ্নীকৃত অর্থ বহুগুণ হয় মালিকের কাছে ফিরে আসবে।এক্ষেত্রে আর পাঁচটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মতো থিয়েটারেও নির্দিষ্ট নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন। এই মনোভাব থেকেই তিনি থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট শৃঙ্খলায় বেঁধে ফেললেন। নিজের থিয়েটারে তিনি ১০০ টাকা বেতনে ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত করলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষকে।গিরিশ এবং প্রতাপচাঁদের যোগাযোগের ফলে বাংলা থিয়েটার ব্যবসায়িক যুগে পদার্পণ করল। এর পূর্বে গিরিশ পার্কার কোম্পানিতে চাকরি করতেন,এবারে তিনি সেই চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি থিয়েটারকে তাঁর জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করলেন।

গিরীশ যুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই পুরনো ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বেশিরভাগই এই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের লেখা 'হামীর' নাটকটি দিয়ে এই থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয়।যদিও এই নাটকে প্রত্যাশিত দর্শক সমাগম হয়নি।দর্শককে আকর্ষণ করতে পারে তেমন নাটকের খোঁজ চললো।ব্যবসায়িক স্বার্থে পরিচালিত রঙ্গমঞ্চ অনভিনীত অবস্থায় দীর্ঘদিন ফাঁকা পড়ে থাকতে পারেনা।ফলে কোনো ভাবেই যখন ভালো বাংলা নাটকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তখন বাধ্য হয়ে গিরিশ নিজে নাট্য রচনায় হাত দিয়েছেন।এর পূর্বে তিনি 'আগমনী','অকালবোধন','দোললীলা' নামে গীতিনাট্য গরুর রচনা করেছিলেন কিন্তু মঞ্চের জন্য নাটক লেখার প্রয়াস এই প্রথম।এই সময় থেকেই গিরিশকে মঞ্চ সাফল্যের দিকে লক্ষ্য রেখে নাটক লিখতে হয়েছে।সেই লক্ষ্যে তিনি নাটকের বিষয়ে নানারকমের পরিবর্তন ঘটিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে দর্শকচাহিদাকে বুঝে নিতে চেয়েছেন।যখন মঞ্চে ঐতিহাসিক নাটকের সাফল্য দেখেছেন তখন ইতিহাসকে অবলম্বন করেই নাটক রচনার প্রচেষ্টা করলেন।পূর্ণাঙ্গ

নাটক হিসেবে তাঁর প্রথম রচনা 'আনন্দরহো' যা ২১শে মে ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়।জাঁকজমকপূর্ণভাবে অভিনয়ের পরেও এই নাটক দর্শক সমাদর লাভ করেনি।তাই গিরিশ পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করলেন।এই থিয়েটার সর্বপ্রথম দর্শকের কাছে আদৃত হয় তাঁর 'রাবণবধ' নাটকাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে।নাটকটি গিরিশকে নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা এনে দেয়।তিনি সুস্পষ্টভাবেই অনুভব করেছিলেন যে দর্শকাকর্ষণের সবচেয়ে ভালো উপায় হিসেবে নাটকের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ভক্তিরসের জোয়ার বইয়ে দিতে হবে।সে কারণেই গিরিশ রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে নাটক রচনা করতে শুরু করলেন।১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর পরিবেশিত 'সীতার বনবাস' নাটকটি অভিনয়ের ক্ষেত্রে আরেকটি মাইলফলক।বনবাসিনী সীতার অশ্রুসজল কাহিনী মহিলাদেরকে অনেক বেশী পরিমাণে মঞ্চাভিমুখী করেছিল।প্রতাপচাঁদও রঙ্গালয়ে মহিলা আসন সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করেছিলেন।রামের চরিত্রে গিরিশের অভিনয় এবং লব-কুশের গান সমস্ত শ্রেণীর দর্শককে উদ্বেল করে তুলেছিল।

এরপর ন্যাশনাল থিয়েটারে অমৃতলাল বসুর 'তিল-তর্পণ',গিরিশচন্দ্রের 'অভিমন্যু বধ',লক্ষ্মণ বর্জন', 'রামের বনবাস', 'সীতার বিবাহ','সীতাহরণ','মলিনামালা' প্রভৃতি নাটকগুলি অভিনীত হয়েছিল।এর অধিকাংশের রচনার পেছনে 'রাবণবধ' এবং 'সীতার বনবাস'-এর পূর্বোক্ত মঞ্চসাফল্য যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছ্ল তা বলা বাহুল্য।১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতেই মহাভারত অবলম্বনে রচিত 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' জনপ্রিয়তার নিরিখে পূর্ববর্তী নাটকাভিনয়গুলিকে ছাপিয়ে যায়।এই নাটকে গিরিশ স্বয়ং কীচক ও দুর্যোধনের ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় করে অপরিমিত প্রশংসার ভাগীদার হয়েছিলেন।

ব্যবসায়ী হলেও প্রতাপচাঁদের প্রকৃতি মূলত কৃপণ ছিল।বেশী পরিমাণ মুনাফার লোভে তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সুযোগ-সুবিধা ও বেতন বাড়ানোর দিকে কখনো নজর দেন নি।তার ওপর থিয়েটারের সঙ্গে জড়িতদের অনেকের প্রতি নির্দয় ব্যবহার,নিয়মের বাড়াবাড়ি,ব্যবসায়িক বুদ্ধিকে থিয়েটারের মাথায় প্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা - এই সমস্ত নানা কারণে গিরিশের সাথে তার মতান্তরের সূচনা হয়েছিল।এর ফলাফল হিসেবে

গিরিশ তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে দলত্যাগ করেন।১৮৮৩-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি অভিনীত 'রাবণবধ' এই মঞ্চে তাঁদের শেষ নাটক।

এর পরেও প্রতাপচাঁদ কেদারনাথ চৌধুরীকে ম্যানেজার করে ন্যাশনাল থিয়েটারের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন।তাঁর উদ্যোগে এই মঞ্চে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের নাট্যরূপসহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকের অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়।এরপর প্রতাপচাঁদ ন্যাশনাল থিয়েটারের স্বত্ব ত্যাগ করেন।তারপর কিছুদিনের জন্য ভুবনমোহন নিয়োগী কিছুদিনের জন্য থিয়েটারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেও অচিরেই থিয়েটার বাড়িটি নীলামে ওঠে।হাতিবাগান স্টার থিয়েটার আড়াই হাজার টাকায় সেটিকে ক্রয় করে ভেঙে ফেলার কিছুদিন পর এই জমিতেই মিনার্ভা থিয়েটার গড়ে ওঠে।

বাংলা থিয়েটার প্রতাপচাঁদ জহুরীর হাত ধরেই ব্যবসায়িক থিয়েটারে পদার্পণ করে।তাই তিনিই রঙ্গালয় ব্যবস্থায় পেশাদারিত্ব প্রচলনের জনক।শৃঙ্খলাবিহীন বাংলা নাটকের গতিবিধিকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করে,তাকে জনরুচির অনুবর্তী হতে বাধ্য করে তিনি থিয়েটারে দর্শকলক্ষ্মীর আগমনের পথকে প্রশস্ত করেছিলেন।তাঁর কারণেই গিরিশচন্দ্র নট এবং নাট্য-শিক্ষক,প্রযোজকের ভূমিকা থেকে মঞ্চসফল প্লে-রাইটে উত্তীর্ণ হন।এর ফলে বাংলা থিয়েটারের যে অগ্রগমন সম্ভব হয়েছিল,পরবর্তী নাট্য-উদ্যোগগুলির মাধ্যমে পেশাদারিত্বের সেই ধারা প্রবহমান থাকে।

৭.৬ গুর্মুখ রায়ের স্টার থিয়েটার

প্রতাপচাঁদ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটার ত্যাগ করার পর গিরিশি ও দলের অন্যেরা 'ক্যালকাটা স্টার কোম্পানী' কোনরকমে অভিনয় করছিলেন।এই সময়ে কলকাতার ধনী ব্যবসায়ী গুর্মুখ রায় মূলত বিনোদিনীর আকর্ষণে দ্বারা পরিচালিত হয়ে গিরিশকে নতুন থিয়েটার খোলার প্রস্তাব দেন।নতুন থিয়েটারে মূলধন বিনিয়োগে দায়িত্ব গুর্মুখ রায় নিজে গ্রহণ করেন বিনোদিনীকে তার রক্ষিতা বানাবার শর্তে।নতুন থিয়েটারের নাম বিনোদিনীর নামে 'বি-থিয়েটার' রাখা হবে তেমনটাই ঠিক হয়েছিল।বাগবাজারের

কীর্তিচন্দ্র মিত্রের ৬৮নং বিডন স্ট্রীটের খাল জমি ইজারা নিয়ে গুর্মুখ রায় সেখানে থিয়েটারের পাকা বাড়ি নির্মাণ করালেন।রেজিস্ট্রির সময় থিয়েটারটি 'স্টার থিয়েটার' নামে নথিভুক্ত হল।বিনোদিনীর নামে থিয়েটার নির্মাণের সমস্ত সম্ভাবনাই বিনষ্ট হল।

স্টার থিয়েটারের মালিক গুর্মুখ রায় হলেও এই মঞ্চের সর্বপ্রধান ছিলেন গিরিশচন্দ্র।প্রায় চার বছরেরও বেশী সময় ধরে তিনি একচ্ছত্রভাবে স্টারের মঞ্চকে শাসন করেছেন।অভিনেত্রী হিসেবে বিনোদিনীর সবথেকে বেশী প্রতিষ্ঠা এই পর্বেই।এই মঞ্চে অভিনীত নাটকগুলির ৯৫ শতাংশই পৌরাণিক এবং ভক্তিরসাশ্রিত।গিরিশ নিজে বেশীরভাগ নাটকের রচয়িতা।তাঁকে ছাড়া এখানে অভিনেতা হিসেবে খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন অমৃতলাল মিত্র,অমৃতলাল বসু,উপেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখেরা।

গুর্মুখ রায় স্বয়ং মাত্র ছয় মাস স্টারের মালিক ছিলেন।এইসময়ের মধ্যে অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - 'দক্ষযজ্ঞ','ধ্রুবচরিত','সীতার বনবাস','চক্ষুদান' প্রভৃতি।এরপর গিরিশেরই পরামর্শে গুর্মুখ রায় থিয়েটারের মালিকানা স্টারের চার সদস্যকে বিক্রি করে দিয়ে এর থেকে বিযুক্ত হন।তিনি চলে যাবার পরেও বিনোদিনী এই থিয়েটার থেকে গেলেন।পরবর্তী চার বছর স্টার থিয়েটারে ধারাবাহিকভাবে নাটকাভিনয় চলেছিল।১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয়ের মধ্যে যে ভক্তিধর্মের প্রাবল্য লক্ষ্য করি তার মধ্যে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়।'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখতে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটারে উপস্থিত হয়েছিলেন।এর পূর্বে ভদ্রসাধারণের অনেকের কাছেই বাংলা রঙ্গালয় অপাঙক্তেয় ছিল।বারাঙ্গনাকে অভিনেত্রী হিসেবে গ্রহণের কারণে নীতিবাগীশেরা থিয়েটারের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না।কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের পদার্পণের সাথে সাথেই এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হল।বিনোদিনীর অভিনয় দেখে তিনি নিজে তাঁকে আশীর্বাদ করেন।এই সংযোগের ফলে তাঁর এবং গিরিশের জীবনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে।স্টার থিয়েটারে অমৃতলাল বসুর 'চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে','বিবাহ বিভ্রাট'-এর মত প্রহসনগুলিও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

'চৈতন্যলীলা' সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে গিরিশ এই নাটকের ২য় ভাগ বা 'সন্ন্যাসলীলা' মঞ্চস্থ করেন।এছাড়া এই মঞ্চে স্যর এডুইন আর্নল্ডের কাব্য অবলম্বনে 'বুদ্ধদেবচরিত' পরিবেশিত হয়।আর্নল্ড নিজে এই নাটকটি দেখে সমগ্র অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।১৮৮৬-এর ১২ই জুন অভিনীত 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' এই মঞ্চের আরেকটি জনপ্রিয় নাটক।ইন্দ্রিয়জ কামনা থেকে ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমভাবনায় উত্তরণের কাহিনী এই নাটকে বিবৃত হয়েছে।কাহিনী,ভাব,চরিত্র ও সঙ্গীত সবকিছু মিলিয়ে 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' একট জনপ্রিয় প্রযোজনার স্বীকৃতি পেয়েছে।১৮৮৭ সালের ৩১শে জুলাই বিডন স্ট্রীটের স্টার থিয়েটারে শেষবারের মতো অভিনীত হয় 'বুদ্ধদেবচরিত' এবং 'বেল্লিকবাজার' নাটক দুটি।এর পূর্বেই নানান কারণে এবং সহকর্মীদের দুর্ব্যবহারে বিনোদিনী স্টার থিয়েটার ত্যাগ করেছিলেন।এরপর তিন্ আর কখনো মঞ্চাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেননি।অবশেষে কলকাতার ধনাঢ্য মতিলাল শীলের নাতি গোপাললাল শীল স্টার থিয়েটারের জমি কিনে নিয়ে সেখানে এমারেল্ড থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন।

৭.৭ এমারেল্ড থিয়েটার

১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর কেদার চৌধুরীর লেখা 'পাণ্ডব নির্বাসন' নাটক দিয়ে উদ্বোধন হয়।৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রিটে স্টার থিয়েটারের জমির ওপরেই এই থিয়েটারটি প্রতিষ্ঠিত হয়।'পাণ্ডব নির্বাসন' নাটকের পর এখানে অভিনীত হল রবীন্দ্রনাথের 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত রায়'।কেদার চৌধুরী ম্যানেজার থাকাকালীন এখানে আরো কিছু নাটকের অভিনয় হয়েছিল,তবে সেগুলি এমারেল্ড থিয়েটারকে ততটা সাফল্য এনে দিতে পারেনি।

থিয়েটার এর মালিক গোপাললাল শীল এই সময়ে গিরিশচন্দ্রকে মাসিক ৩৫০ টাকা বেতন এবং ২০ হাজার টাকা বোনাসের বিনিময়ে থিয়েটারের ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত করেন।গিরিশের উপস্থিতিতে এখানে প্রথমেই 'নীলদর্পণ','সীতার বনবাস','সীতাহরণ','নবীন তপস্বিনী','মায়াতরু' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রতাপচাঁদ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটারে দায়ে পড়ে গিরিশ কে নাটক রচনা করতে

হয়েছিল।এমারেল্ডে আসার পূর্বেই গিরিশ নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছেন।এই সময়ের প্রতিটি রঙ্গালয়ই গিরিশকে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছে।বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' উপন্যাস ও মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নাট্যরূপের সাথে এখানে অভিনীত হয়েছে গিরিশের 'পূর্ণচন্দ্র' নাটক।এছাড়া মধুসূদনের প্রহসনদ্বয়,দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক' ও 'নীলদর্পণে'র অভিনয় চলছে রমরমিয়ে।

এমারেল্ড থিয়েটারে যখন খ্যাতির মধ্যগগনে সেই সময় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি এই থিয়েটারে যোগদান করলেন এবং 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের জলধরের ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় করে দর্শকদের মাতিয়ে তুললেন।এই থিয়েটারে বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসের নাট্যরূপ গুলিও সাফল্যের সাথে অভিনীত হচ্ছিল।এর মধ্যেই থিয়েটার মালিক গোপাললাল শীল এমারেল্ডের মতিলাল সুর,পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য,পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও ব্রজনাথ মিত্রকে থিয়েটার বাড়ি লিজ দিয়ে সেটা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন(৩রা ফেব্রুয়ারি,১৮৮৯)।এর ফলে তার সঙ্গে হওয়া গিরিশের চুক্তির অস্তিত্বহীন হয়ে পড়লো।গিরিশ এমারেল্ড ছেড়ে পুনরায় ষ্টারে যোগদান করলেন।

গিরিশ চলে যাওয়ার পর নতুন মালিকেরা এমারেল্ড থিয়েটারকে ঠিকমত চালাতে পারলেন না।গোপাল শীল পুনরায় থিয়েটারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করলেন(৮ই এপ্রিল,১৮৮৯)।পরিচালক হিসেবে মনোমোহন বসু এবং নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র এই সময় এখানে নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই বছরেরই ৪ঠা মে কেদার চৌধুরীকে পুনরায় ম্যানেজার করে নিয়ে আসা হয়।তবে কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে অতুলকৃষ্ণ পাকাপাকিভাবে বিজনেস ম্যানেজারের দায়ভার গ্রহণ করেন(১৭-১-১৮৯০)।

১৮৯০ সালের পরবর্তীকালে এই থিয়েটারটির অবস্থা পূর্বের তুলনায় সঙ্গতি হারাতে থাকে।১৮৯৩ সালে মহেন্দ্রলাল বসু ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র এই থিয়েটারের লেসি হন।তবে এর পূর্বগৌরব কিছুটা হলেও ফিরে আসে ১৮৯৪ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর অতুল মিত্রের 'মা' নাটক অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে।অর্ধেন্দুশেখরের জন্যই থিয়েটারটি অনেকাংশে পুনরুজ্জীবিত হয়।এরপর ১৮৯৫-এর ১০ই নভেম্বর এমারেল্ডের মালিকানা

হস্তান্তরিত হয়ে বেনারসী দাসের হাতে চলে যায়।এইসময় এখানে বঙ্কিমের 'কপালকুন্ডলা' এবং রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা'র নাট্যরূপ,রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'র নাট্যরূপ 'দুকড়ি দত্ত',ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ফুলশয্যা' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হয়।

১৮৯৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি এমারেল্ডের শেষ অভিনয় হয়।এরপর সেখানে কিছুদিনের জন্য 'সিটি থিয়েটার' চলেছিল।১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে সিটি থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেলে সেখানে 'ক্লাসিক থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭.৮ অনুশীলনী

১. অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের অবতারণার পিছনে বাংলা রঙ্গালয়ের কতটা ভূমিকা ছিল বর্ণনা কর।

২. 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' কী? বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস এই আইনের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিল?

৩. বাংলায় ব্যবসায়িক থিয়েটারের উত্থানের ইতিহাস এবং কারণগুলি আলোচনা কর।

৪. 'স্টার থিয়েটার' (বিডন স্ট্রীট) কে প্রতিষ্ঠা করেন? এই থিয়েটারের অভিনয়ের বর্ণনা দাও।

৭.৯ গ্রন্থঋণ

১. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস - দর্শন চৌধুরী

২. বাংলা নাটকের বিবর্তন - সুরেশচন্দ্র মৈত্র

৩. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস - শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

৪. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর - অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৫. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য়) - আশুতোষ ভট্টাচার্য

মন্তব্য

৬. ভারতীয় নাট্যমঞ্চ - হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

৭.বাংলা থিয়েটার - কিরণময় রাহা